শারদীয়া সমাজ সংবাদ

BENGALI ASSN. OF GRTR CHICAGO

বেঙ্গলি অ্যাসোশিয়েশন্ অফ্ গ্রেটার শিকাগো

“Investing is Simple, but not Easy” - Warren Buffet

Are you investing successfully for the long term?

Despite making enough money, most people struggle to achieve their long term financial goals. They employ trial and error investment strategies, trying to pick the next hot stock or mutual fund. Lacking a clear investment plan and execution strategy, they often assume more risk than necessary and thereby diminish their chances of achieving their goals.

What does it take to invest successfully?

Successful investors have a well thought out investment plan and strategy, which they execute consistently over the long haul. Just as successful athletes have a plan and strategy in place and achieve success with the help of a coach, successful investors need a good investment plan and strategy that they can execute with the help of a good investment adviser.

V2 Financial Group, an Independent fee-only advisor, provides sophisticated advice and manages your investment accounts on your behalf

Our Services

Portfolio management (manage your IRA's, 401(k)'s and other investment accounts)
Planning (Insurance planning, Retirement & College projections and planning)

Why V2?

Fiduciary (unlike brokers), operating with your best interests in mind
Individualized portfolio management
Unbiased product selection. No Commissions. Conflict-free advice
Sophisticated, holistic approach

VENKAT KRISHNAMURTHY & VENKATA VEDAM

V2 FINANCIAL GROUP, LLC

1536 East Bailey Road
Naperville IL 60565
(630) 364-4529 (Phone)
(630) 839-6169 (Fax)

V2 financial Group, LLC

www.v2financialgroup.com

Please contact us for a no-obligation consultation

venkat@v2financialgroup.com

vedam@v2financialgroup.com

DISCLOSURES

Registration as an investment adviser does not constitute an endorsement of the firm by securities regulators nor does it indicate that the adviser has attained a particular level of skill or ability. Information presented does not involve the rendering of personalized investment advice, but is limited to the dissemination of general information on products and services. This information should not be construed as an offer to buy or sell, or a solicitation of any offer to buy or sell the securities mentioned herein.

All investment strategies have the potential for profit or loss. Changes in investment strategies, contributions or withdrawals may materially alter the performance and results of your portfolio. We only transact business in states where we are properly registered, or are excluded or exempted from registration requirements.

শারদীয়া সমাজ সংবাদ

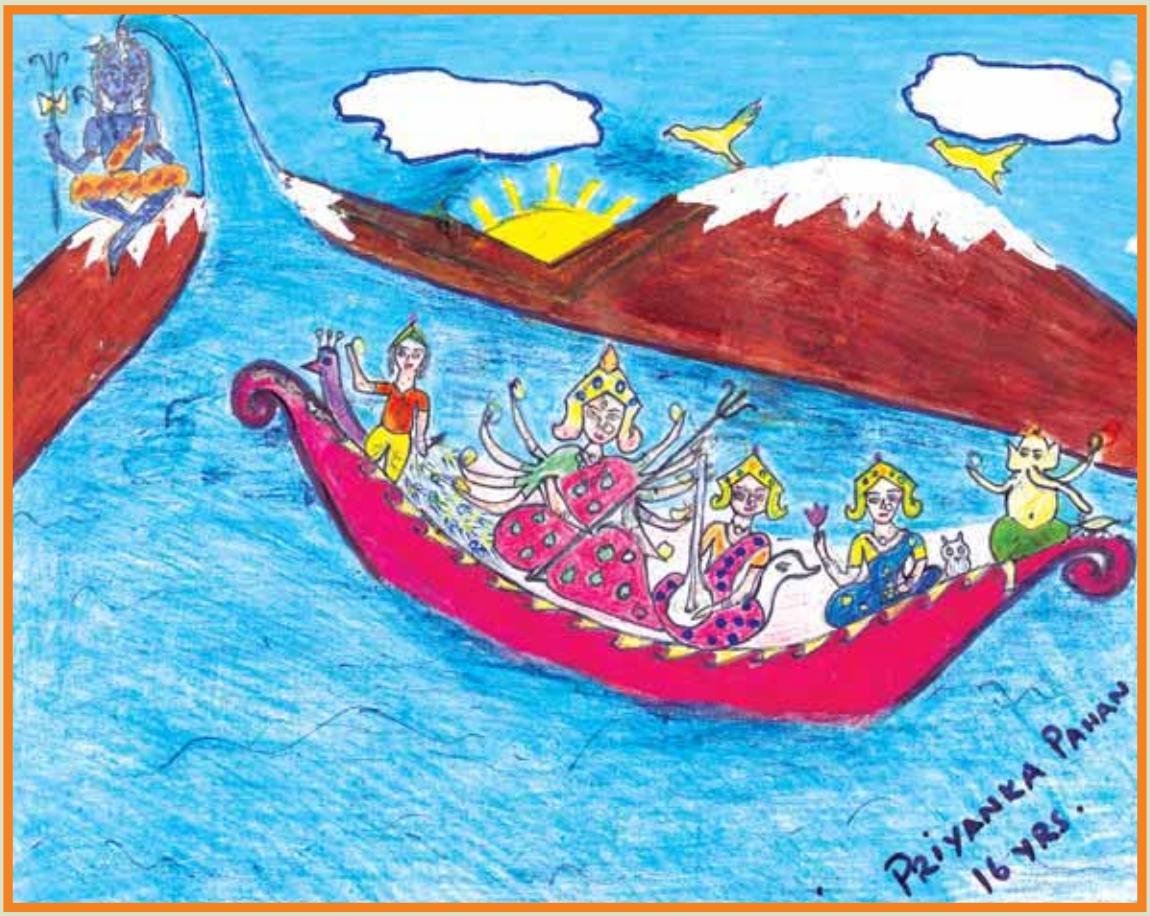

সম্পাদক

কাকলি দাশগুপ্ত এবং বকুল ব্যানার্জ্জী

২০১৪

Binita Gupta - Age 15

Maya Feldbruegge - Age 5

Avani Feldbruegge - Age 5

“যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমো নমঃ”

A BAGC Retrospect – 2014

➢ **যুগ্মসম্পাদক ঃ**
কাকলি দাশগুপ্ত
বকুল ব্যানার্জ্জী

➢ **প্রচ্ছদ শিল্পী ঃ**
সুমিত রায়

➢ **প্রকাশক ঃ**
বেঙ্গলি অ্যাসোশিয়েশন্ অফ্ গ্রেটার শিকাগো

➢ **রূপায়ণ ও ব্যবস্থাপনা ঃ**
অনুশ্রী ব্যানার্জ্জী
ই-মেল : a_banerjee@iinet.net.au

➢ **মুদ্রণ ও অলঙ্করণ ঃ**
নিওস্পেকট্রাম ইন্ডিয়া
ফোন : + ৯১ ২৩৯৬ ৬৭১৭
ই-মেল : neospectrumindia@vsnl.net

DISCLAIMER

Articles in *Sharodiya Samaj Sangbad*, BAGC's annual magazine, are obtained from individual members. The editors are not responsible for the content of these articles. The opinions expressed in these articles are solely those of the contributors and are not necessarily representative of BAGC.

2014 BAGC COMMITTEE

President:	
Debasish Gooptu	847-722-9216
Vice-President:	
Amitava Deb	815-469-4010
Secretary:	
Ashok Ghose Dastidar	630-310-7666
Treasurer:	
Bikramjit Dewanjee	630-802-7060
Deputy Treasurer:	
Uditt Mukherjee	630-235-7774
B B Chairperson / Puja:	
Monisha Datta	630-776-0676
B B Vice Chairperson / Puja:	
Soma Sanyal	847-942-3523
Puja:	
Sumita Ghosh	847-867-5550
Madhumita Basu	847-452-1288
Cultural:	
Manisha Bose	630-789-8505
Ranjita Chattopadhyay	419-410-9344
Seminar:	
Sunayana Yang	331-442-6654
Food:	
Tuhin Majumdar	331-625-9860
Newsletter:	
Kakali Dasgupta	815-577-8470
Bakul Banerjee	630-682-5727
Communications:	
Abhik Paul	510-759-5536
Young Adults/Youth:	
Soma Roy	630-405-3121
Reemlee Dhorchoudhury	847-274-6001
Suranjana Chattopadhyay	630-898-8283
Facilities:	
Praneet Chakraborty	630-853-3980
Rahul Chatterjea	630-513-7580
Subhash Mookerjee	847-254-7132
Fund Raising:	
Shubham Sanyal	847-372-2535
Sonali Biswas	847-392-7480
Information Systems:	
Nina Palit	224-578-0347
Ananta Bardhan	630-229-4920
Web and Email:	
Rana Bose	847-809-5888
Registration:	
Amitabha Biswas	630-333-2093
Sauparna Sarkar	219-629-0626
Sports:	
Anirban Das	224-280-4037
Aian Mazumder	630-212-9948

সূচীপত্র

—:: YOUTH SECTION ::—

Moving Forward	Ahona Mazumder	২
A Crossword Puzzle	Abhita Chakrabarti	৩
A Crossword Puzzle	Sharonee Chakrabarti	৪
Growing Up with BAGC	Aniket Biswas	৫
My Dadu	Aayush Chanda	৬
Stolen Lines	Anjan Ghosh	৭

—:: ADULT SECTION ::—

পানশিউলি	অঞ্জলি ভট্টাচার্য	১৩
বললে না খুলে	অলক ভট্টাচার্য	১৫
Tsar-জ সন্তান	অলক ভট্টাচার্য	১৫
না যেওনা, তুমি-ই যেওনা	ব্রজেন আগরওয়ালা	১৬
মনের মানুষ	বানী ভট্টাচার্য্য	২০
শখের কবি	দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	২৩
যোগসূত্র	ধীমান চক্রবর্তী	২৪
আমার মধুবালা	এম. এম. খায়রুল আনাম	২৫
মা	দেবীপ্রিয়া রায়	৩০
কাজী নজরুল ইসলামের বিবাহিত জীবন	এম. এম. খায়রুল আনাম	৩৬
আকাপুল্কোয় আড্ডা	কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী	৪১
পার্থর বনবাস	খনা দেব	৪৫
দাদার বাঘ শিকার	মেখলা বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯

সূচীপত্র

ভাঙল ঝড়ে	মনীষা বসু	৫২
দূর বহুদূর অনেক দূর	মনীষা বসু	৫৬
মিনতি	মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়	৫৭
পথের সাথী	রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়	৫৮
হ্যামলেটের প্রশ্ন	শুভম সান্যাল	৬১
A Retrospective Interview with Dr. Sudip Bose	Bakul Banerjee	৬২
Quiz	Basanti Banerji	৬৪
To the Parents of School Massacres	Debdas Banerjee	৬৫
Memories Ever-Alive	Indrani Mondal	৬৬
Motifs of a Summer Evening	Juthika Basu	৭৪
Mia, the Fussy Eater	Janice Das	৭৫
Life Remembered	Kakali Dasgupta	৭৭
Travels through Karnataka	Paroma Banerjee	৭৯
Moments	Prakriti Chakrabarti	৮২
Stroll Down The Memory Lane	Priti Paul	৮৩
Winter Storm	Sabita Busch	৮৫
An Enchanting Visit to VAROSHA Sites	Samar Kundu	৮৬
एक पाती परमहंस देव के नाम	रेखा मैत्र	৮৮

সম্পাদকীয়

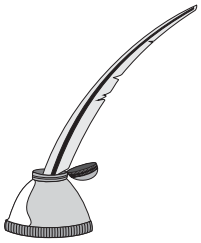

'শরতে আজ কোন অতিথি এল প্রাণের দ্বারে ।
আনন্দগান গা রে হৃদয়, আনন্দগান গা রে ।।'

প্রতি বছরের মতনই শরৎকালে আমাদের প্রাণের অতিথি, আনন্দময়ী দেবীমাতৃকাকে শারদোৎসবে বরণ করতে শিকাগোবাসী বাঙালীরা উন্মুখ । হাজার রকমের কর্মব্যস্ততা সত্ত্বেও প্রস্তুতি চলছে বেশ কয়েক মাস ধরে । আড়াই দিনের এলাহি ব্যবস্থা, পূজার আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মহড়া সবই শুরু হয়ে গিয়েছে আগেই, কার্যনির্বাহী সমিতির পরিচালনায় । যদিও আমাদের আশেপাশের সাধারণ মানুষের মধ্যে নেই দিনগোনার উত্তেজনা, নেই দোকানে বাজারে উপচে পড়া ভীড়, নেই চাঁদা তোলা বা প্যান্ডেল বাঁধার প্রস্তুতি, কিন্তু বিএজিসি-র তরফ থেকে ঘন ঘন ই-মেলের মাধ্যমে জানান এসে যায় — আর দেরী নেই — অক্টোবর মাসের প্রথমেই মাতৃবন্দনায় সবাই একত্র হব । খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এই প্রস্তুতি পর্ব্ব চলেছে — আপনারা সবাই জানেন আমাদের খুব আদরের, প্রাণ প্রাচুর্য্যে ভরা কিশোর রাজা গঙ্গোপাধ্যায়, কয়েক মাসের আপ্রাণ জীবন সংগ্রাম চালিয়ে, সবাইকে অশ্রুজলে ভাসিয়ে চিরবিদায় নিয়েছে । দুঃখে এবং শোকে মায়ের আঁচলের তলায় আশ্রয় নেওয়া আমাদের সহজাত প্রবৃত্তি, মা ছাড়া এই আঘাত কে বুঝবে । কঠিন হলেও, আসুন সবাই মিলিত হয়ে এই অসহনীয় হৃদয়বেদনা মাতৃচরণে নিবেদন করি ।

দেবীর আগমন এবছর নৌকায় । যানজটের আশঙ্কা নেই, তাই নৌকারোহী দেবী এবছর বেশ আগেভাগেই সন্তানদের কাছে আসছেন । সম্পাদকদেরও তাই অনেক আগে থেকেই তাগাদা দিতে হয়েছে জনসাধারণকে, 'বেলা গেল, বেলা গেল — তাড়াতাড়ি পূজাসংখ্যার লেখা পাঠাও ।' আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে শতেক কাজের মধ্যেও অনেকেই সেই ডাকে সাড়া দিয়েছেন । এই মানস পুত্র-কন্যাদের ডালি ভরে সাজিয়ে সকলের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা ধন্য । সবচেয়ে আমাদের আনন্দ আর গর্ব আমাদের সমাজের শিশু, কিশোর কিশোরী, তরুণ তরুণীদের লেখা আর শিল্পকর্ম প্রকাশ করতে পেরে । যা কিছু শ্রেষ্ঠ, যা কিছু সুন্দর তাই আমরা মাতৃচরণে উৎসর্গ করি । সুদূর বিদেশে বসে, শারদোৎসবের এই বিশিষ্টতা যেন চিরকাল অক্ষুন্ন থাকে ।

বিএজিসি-র তরফ থেকে প্রীতির এই অর্ঘ্য আশাকরি সকলের ভালো লাগবে । ঁবিজয়ার শুভেচ্ছা রইল সকলের প্রতি — মায়ের মঙ্গলাশীষে সকলের জীবনযাত্রা হোক শুভ এই কামনা করি ।

কাকলি দাশগুপ্ত
বকুল ব্যানার্জ্জী

Moving Forward

Ahona Mazumder (Age 18)

Push me away;
Towards the future,
For the future,
Or the future
Will just remain as the past:
The same,
Unchanged,
Still chained,
Waiting to be set free.

Old tasks mastered,
And new tasks captured,
Refined
To save time;
No more wasting time searching.

While everything is changing,
Do you change too?
Do you count the seconds?
No time going unused.
Or do you make the seconds count
Discovering the truth.
Discovering you.

Sleepless nights of over thinking
Feeling like a ship that's sinking
But only sinking to rise again
Finding new seas to travel in.

Chasing reflections
Missing directions,
Losing connections,
All for the better;
Releasing the tether.
Taking the leaps and learning to fly.
Forgiving the truth for the first time.

It's adding and subtracting for all of your life.
You win some.
You lose hope.
You give love.
And take faith.
But always multiply, never divide
Because nothing should make you feel so small.
So use your heart and always try.

Shout in excitement for the future
Stop crying for the past.
Because right now,
Whether good or bad.
Will always never last.

A Crossword Puzzle

Abhita Chakrabarti (Age 11)

Across

1 Goddess of learning
4. A winner of wars
6. Middle child
8. Laying down/sleeping
10. nose
11. How many days
14. sound/noise
15. My name
18. River
19. you
20. Mother
21. eye (minus AAKAR)
22. Resembling Goddess Lakshmi in beauty and merits
25. Let's go!
26. To apply one's mind (two words)
28. to do
29. Tomorrow/Yesterday
30. profit/gain
31. Worker/artist

Down

1. Popular Bengali sweet
2. an arrow
3. to name someone
5. my dadu's name/world
7. my grandmother
13. Classical Indian dance style
16. Opposite of brave
17. A language spoken in Southern india and and Srilanka
21. "Dance" in Sanskrit
23. Rupak uncle
24. Inferiority/Lowness
24a. Anger
27. Attached
28 Orange
29. Father's brother as in Asit___.
29a. Truck to transport goods

(Clues are in English. Words are in Bangla.)

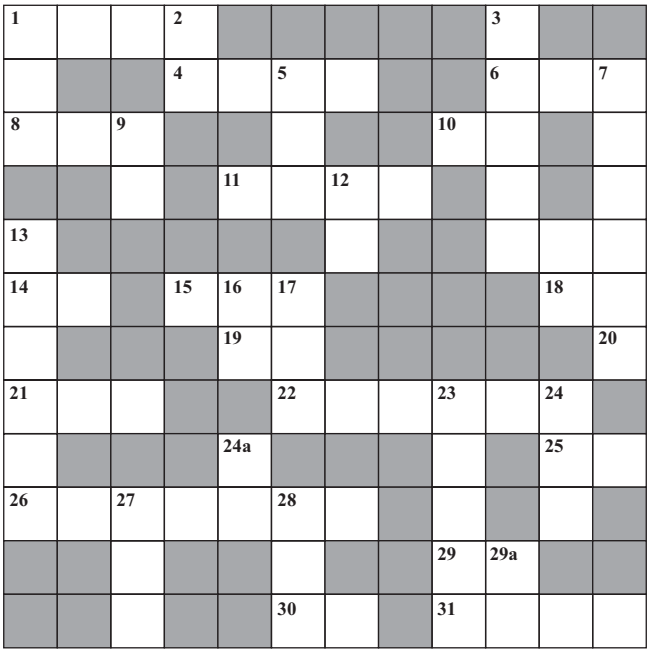

শব্দের ধাঁধা

Crossword Puzzle in Bangla

(Turn to page 6 for answers)

A Crossword Puzzle

Sharonee Chakrabarti (Age 9)

Across

1. worship or prayer
2. gymnastic (written in Bangla)
5. jewel
7. a few days
9. food
10. my mother's name
11. police captain
14. hand
15. juice
16. chilli peppers
17. name of a girl (Reshmi's sister)
18. my name
19. a meal
20. bracelet
21. A drink most Indians like
22. uncle's wife
23. belonging to me as an older sister to someone
24. father's mother
26. sour
27. Tumpa Mashi's birthday/a day of prayer to God
28. simple
29. after this
30. battle

Down

3. belonging to dance
4. if
7. poem
8. the way Bengalis great each other
9. bed
10. empress
10a. opinion
12. A Bengali last name (short for Gangopadhyay)
13. spinach
16a. reason
17. hand pulled carriage
18. greens
19A. Father's day
20. belonging to Aunt
21. over 3, but bellow 5
22. nickname for uncle
24. joke's
25. debt/loan
26. notebook

(Clues are in English. Words are in Bangla.)

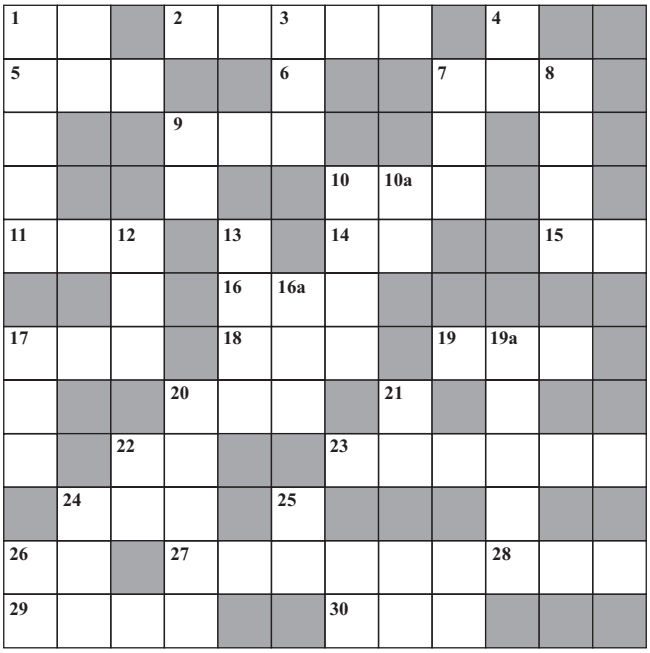

শব্দের ধাঁধা

Bangla Crossword Puzzle

(Turn to page 6 for answers)

Growing Up with BAGC

Aniket Biswas

Since moving to the United States in 1997, my family has firmly planted its roots into American soil, branching out in ways none of us could imagine even a decade ago. Our roots have given way to a massive tree, towering over our collective lives everyday. And yet, there is a branch of that tree shared by myself, both my parents, and my younger brother: BAGC. BAGC has both created lifelong friendships and facilitated my desire to strengthen my Indian identity from a young age; and these recent years, it has guided me further on the occasionally exhausting, but rewarding journey into adulthood.

It all began in early 2012, as we were preparing for Saraswati Puja. Years of conditioning had me prepared for frequent visits to the vending machines, a gratuitous mixture of American and Indian food, and hours upon hours of wandering the hallways of whichever high school we temporarily inhabited with legions of hyperactive Indian children. But this year was different. As I laid my winter jacket on a nearby table, my father set a cardboard box on the table, scrounging its contents. He pulled out a thin name tag with the words "Aniket Biswas: Youth Committee" and pinned it to my orange *kurta*. "I have some things for you to do," he told me in a rushed voice, as I realized that this year would not be like the rest. Sure enough, I found myself filling in for the duties I would see my father do when I was six; whether serving food, organizing the child recreation room, or guiding the elderly to their seats in the auditorium, I knew that I would no longer be looked upon as a child within this community. Sure, mashis and meshos alike would continue to pinch my cheeks, never ceasing to be amazed at the wonder that is height increase; yet they would simultaneously treat me differently, giving me an initially jarring look into what was coming for me. As the year progressed, and I became even more inundated with opportunities to assert my adulthood, that jarring feeling disappeared, signaling my integration into a demographic I had only speculated about for years.

Although BAGC gradually guided me into the role of an adult, there was a single moment last year that solidified my status as a card-holding member of The Grownups Club. It occurred with a phone call, one of our family friends asking if I was interested in acting in a play. However, this would not fall into my already large repertoire of kiddie theatre and dances. It was not a rehash of my infamous Hulo-Beral portrayal that struck fear into the hearts of many, nor a repeat of the renowned "Palqui-dudes" dance from Khirer Putul. Instead, I was asked to participate in a play about the struggles of an Indian American family when their eldest son enlists in the army. Although my character was that of an elder adolescent, I could tell that the fact that I was even considered for this role was a signal for something. It was a sign that people were actually taking some of what I had to say seriously, a sign that I wasn't just growing from a vertical perspective.

I still often refer to myself as a child when I go to BAGC events. I still get the kid's food, and I still occasionally wander the halls of the respective high schools, divulging into extensive debates on the quality of Bollywood cinema with my friends. But it is clear that in many ways, I have indeed matured in my community; I hope to continue down this path, as the tree my family planted continues to flourish and stand its ground.

My Dadu

Aayush Chanda (Age 13)

Hi Dadu, How are you?
We're okay too.
Are you able to see us?
Are you giving bad angels a crash with a bus?

We're missing you every day,
And it's as if we're to pay,
But it wasn't your heart pierced with a knife,
It's only the circle of life.

Please bless everyone here,
They came from far and near,
Because they all love you,
And I hope you do too.

Note: My Grandfather recently passed away in Kolkata. This poem is in remembrance of him.

Abhita Chakrabarti (Age 11)

1 স	র	স্ব	2 তী						3 না		
ন্দে			4 র	ন	5 জ	য়			6 ম	ধ্য	7 ম
8 শ	য়	9 ন			গ			10 না	ক		নী
		য়		11 ক	ত	12 দি	ন		র		ষা
13 ভা						দি			ণ		দি
14 র	ব		15 অ	16 ভী	17 তা					18 ন	দি
ত				19 তু	মি						20 মা
21 না	য়	ন			22 ল	ক্ষ্মী	স্ব	23 রূ	পি	24 নী	
ট্য				24a রা				প		25 চ	ল
26 ম	নঃ	27 সং	যো	গ	28 ক	রা		ক		তা	
		ল			ম			29 কা	29a ল		
		গ্ন			30 লা	ভ		31 কা	রি	গ	র

Answer

Sharonee Chakrabarti (Age 9)

1 পূ	জা		2 জি	ম	3 না	স্টি	ক		4 য		
5 র	ত	ন			6 চে			7 ক	দি	8 ন	
বী			9 খা	বা	র			বি		ম	
দি			ট			10 ম	10a ম	তা		স্কা	
11 দা	রো	12 গা		13 পা		14 হা	ত			15 র	স
		ঙ্গু		16 লং	16a কা	রা					
17 রি	ম	লি		18 শা	র	ণী		19 খা	19a বা	র	
ক্			20 কা	ক	ন		21 চা		বা		
সা		22 কা	কী			23 শা	র	ণী	দি	দি	র
	24 ঠা	কু	মা		25 ধা				ব		
26 খা	ট্টা		27 দে	বা	র	তী	দি	ব	28 স	র	ল
29 তা	র	প	র			30 র	ণ				

Answer

Stolen Lines

Anjan Ghosh

–:: Scene 1 ::–

(At the town square, there is a crowd of people watching artists perform a song. People walk in and out of the scene randomly, creating a very loud atmosphere. However, as soon as the NARRATOR comes out all the sound fades down, the stage lights as well and the spotlight is on NARRATOR.)

NARRATOR: Welcome folks to Tellumla Square! If you like live entertainment, then this is the place for you! Here at Tellumla Square, multiple artists and musicians come everyday to perform! However, today you won't have time to listen to any performers. You are all here instead to see Jimbo, a friend of mine. Well more than that I should say. You're here to see Jimbo's career. How it all started and ended, in this fine Square. Lets start at the beginning. (Stage lights are back on, music is booming and the crowds again cheering.)

See that boy over there, sitting as close as possible to the musicians. That's Jimbo right there. He loves music. Tellumla Square was like his second home. Some would argue that he actually spends more time here than at his actual home.

(Spotlight is off of Narrator. Narrator exits. Musicians seem to be packing up. Crowd wants more.)

LEAD SINGER: Okay folks. Thanks a lot for listening to us here at beautiful Tellumla Square! I think I'll end my performance with a little slow tune I like to call, "Blue Moon".

JIMBO: (Leaving the crowd) Now that's something I can do without. (Sits on a picnic table. Soon joined by Clarissa)

CLARISSA: I knew I should have looked here first. However, I would've thought to find you in the crowd listening to the…

JIMBO: Music. Yes I was listening. I just needed to take a break. I wasn't in the mood for that song anyways.

CLARISSA: I guess you were in the mood to miss lunch though right? You know, you do have a life outside of Tellumla Square.

JIMBO: Do I really? I'm starting to doubt that… You see, when I'm in this lovely square, with the music booming next to me, what's the point of going anywhere else. There's no life better than this. Except…

CLARISSA: Except what? (Saying sarcastically.) What can possibly be better than your dream world here?

JIMBO: To be the creator.

CLARISSA: What?

JIMBO: Actually performing on stage, in Tellumla Square. With a live audience watching you. And the best part... the applause. Oh that must feel thrilling! And then you go play the next song. But… That's the reason I can't do this.

CLARISSA: Wait. What's the reason you can't do what? I'm confused?

JIMBO: Oh Clarissa! Don't you know anything! I won't be able to play a song because I can't sing or play any instruments!

CLARISSA: So?

JIMBO: Now you're killing me! What do you mean by saying "so?" If I can't do any of that stuff how am I suppose to perform for people?

CLARISSA: Can you talk?

JIMBO: (Says sarcastically) No Clarrisa I can't (gets cut off)

CLARISSA: Are you creative?

JIMBO: Well… I guess. Sure. Why?

CLARISSA: Perfect!

JIMBO: How's that perfect?

CLARISSA: Jimbo let me introduce you to a thing I like to call poetry. It's perfect for you. You've got great ideas in your head. With poetry you just spit all those ideas out. Simple as that.

JIMBO: Poetry! Are you crazy? People don't come to Tellumla Square to hear people "spit ideas out"! (An older man comes near JIMBO and CLARISSA)

TONY: What makes you so sure about that boy? (Jimbo and Clarissa caught by surprised by the man) Sorry. I couldn't help but overhearing. My name is Tony.

JIMBO: Names Jimbo. And this is my sister Clarissa

TONY: Please to meet you both. Now tell me. What's wrong with being a poet?

JIMBO: There's nothing wrong with it sir. It just… um. It doesn't sound exciting. I mean, who cares about listening to some Tom, Dick or Harry blabbering a bunch words.

TONY: You know, most of human communication is used through words. Words hold ideas to everything and anything. Words are powerful.

JIMBO: To what extent? For entertainment in Tellumla Square?

TONY: To any extent. That's the beauty of poetry. It can be anything and everything. It's the job as the poet, to figure out what he wants it to be.

(Looks at watch)

Oh look at the time. I'm gonna be late. I'm sorry kids. See you later maybe.

(Starts walking towards stage L where performance stage is)

JIMBO: Bye Tony... Wait where is he going?

(Tony gets on stage and speaks to the crowd in Tellumla Square)

TONY: Hello folks! My name is Anthony Carnelli, but you all can call me Tony. Today I'll be sharing with you some poetry written by William Blake, Shel Silverstein, Robert Frost and others. I'll also share some of my works too.

JIMBO: This whole time I've been arguing about how boring poetry is... with a poet! I'm such an idiot.

CLARISSA: Shh! I can't hear him.

(Stage lights dim and spotlight on Tony dims as he says his line.)

TONY: *If the doors of perception were cleansed, everything would appear as it is - infinite.*

JIMBO & CLARRISA: Whoa…

–:: Scene 2 ::–

NARRATOR: Jimbo and Clarrisa both stayed to watch Tony's whole performance. Jimbo as well as the audience around him were amazed of the power of poetry. Poetry was surprisingly a new experience for Tellumla square. After that night, Jimbo came home with his mind fixed that he would become a poet and would perform at Tellumla Square. Ever since then, he started reading works of famous poets and he even started writing poetry himself! He put all of his writings in a book. As time passed the book got bigger and bigger, until finally it was ready to be opened. Let us skip three months ahead - Jimbo's first performance at Tellumla Square.

(Narrator exits. Stage lights are on. Crowd has gathered. However Jimbo is nowhere to be seen.)

FATHER: Where is he? Why is he taking so long? You know how much work I've got. I don't have anytime to listen to some hippie poetry crap!

CLARRISA: Dad, trust me. This is really worth the time. I've been listening to Jimbo recite some of his poems. They're truly genius! Look here he comes!

(Jimbo enters.)

JIMBO: Hello. My name is Jim Henderson, but you can call me Jimbo.

FATHER: (Aside.) What kind of freak name is "Jimbo?" I told you this was going to be gypsy crap. Plus what's wrong with Jim Henderson. It's a fine name. Its the same name your grandfather had and his father as well, and his father as well, and —

CLARRISA: DAD SHUT UP!

FATHER: (To Clarrisa.)Do you see anything wrong with the name?

CLARRISA: Jimbo sounds cooler. Be quiet.

JIMBO: Okay, well I'm gonna start now… (Freezes in position.)

FATHER: What the heck is wrong with him? Why's he frozen like that? Stupid hippie crap.

JIMBO: *Ever since the man came, everything has frozen. Games never finished. Thoughts never completed. Meaning manifested into a long, thin icicle. The icicle grew and grew. Why? No one knew. And no one will ever know, because all is frozen.*

(Applause from crowd)

FATHER: It's not that bad.

CLARISSA: It's okay dad. You can go to work now.

FATHER: No need to rush me. I just got here.

CLARISSA: What about all of that work you could be getting done dad? Come now, you are much too dignified to waste your time with this "hippie crap".

FATHER: I've got all day to finish that stuff. Now please be quiet he's gonna say another one. My boy. My boy Jimbo.

–:: Scene 3 ::–

NARRATOR: The crowd was frozen after hearing that first poem. Even Jimbo's dad liked the poem. This was the start of Jimbo's career in Tellumla Square. The next performance I'm gonna show you is very important. You see, some of the kids in his grade came heard that Jimbo was stirring much excitement in Tellumla Square. One of the kids that came to the performance was Patricia Kenly. She was "the girl of the grade" so to speak. Jimbo was infatuated with her from the moment he set eyes on her. Patricia was "interested" in him as well. However, that didn't stop the other guys in the grade from trying to win her affection. Let's see the performance.

(Narrator exits. Stage lights are on. Crowd has gathered. Jimbo is onstage.)

JIMBO: Thank you so much folks for coming. It's always fun being here.

CHUCK: Thank the lord! Holy crap that was BOOOOOORING! Hey Patty it's finally over. Let's not waste anymore time and go somewhere else. Okay babe?

PATRICIA: You can leave if you want Charles -.

CHUCK: Please call me Chuck.

PATRICIA: No, I'm fine with Charles.

CHUCK: If that works better for you babe, Charles it shall be. Can we just go now? I think I have aged 50 years in the past 30 minutes listening to this idiot.

(During this time everyone has left and Jimbo has been relaxing at a table near the stage with a glass of lemonade)

PATRICIA: (Saying to herself) There he is. (Telling Chuck) Look, I'll meet you at Eddie's at 7:00. I need to do some stuff before that.

CHUCK: Why can't I come along? Is it private or something?

PATRICIA: Yeah something like that. Please go, I'll meet up with you later.

CHUCK: Okay. (He starts walking out then stops and notices Patricia walking near Jimbo. He stands aside waiting to see what happens.)

PATRICIA: That was a pretty great performance.

(Jimbo spills lemonade all over himself.)

Let me clean that for you. It's my fault anyway.

(Goes over to him, gets napkin starts to clean his shirt.)

JIMBO: Thank you

PATRICIA: (Interrupts him and kisses him.) Let's go somewhere else.

CHUCK: So should I ask them for a table for three instead? You're planning on bringing Jimbo along or were you just gonna ditch me and go "somewhere else" with him? Uh? What's so great about this fool? Just because he can blabber a bunch of words? Saying a bunch of words suddenly makes you king of the world or something!

PATRICIA: Chuck that's where you're wrong! Jimbo's a creator. He creates beautiful poetry. You can't create anything!

(Chuck walks to Patricia, grabs and shakes her roughly.)

CHUCK: You're coming with me tonight. Not that loser.

PATRICIA: Get off of me you freak! Get off!

(Frees herself from him. Jimbo then lands a punch on him. Chuck falls flat on the ground. Jimbo in extreme rage keeps throwing punches at him!)

You can stop, Jim. Stop it! You don't need to keep going! What wrong with you! Stop! STOP!

(She runs away)

JIMBO: (Gets up and stops punching Chuck.) Wait, Patricia. Come back! (Turns around to see two cops) What's happening?

COP 1: What do you think is happening boy?

JIMBO: I didn't do anything I swear. He started it all!

COP 2: (Walking behind him and cuffing him) *He started it all! WAH WAH WAH!!!* We know what we saw boy. So I advise you to shut your trap.

(The cops exit with Jimbo. Chuck sits down where Jimbo was before.)

CHUCK: Stupid moron! Thinks he's so tough. (Kicks a table over. There's a moment of silence. Then he feels his face with his hands and gets blood all over them) Crap! He punched my me pretty bad. He's gonna pay for it. I'm gonna show him how it's done next time... (Sees a book on the ground and picks it up). Now what do we have here? Wait this is his poetry book!(Chuckles). Look at all of these poems. He's probably never had time to recite all of these. (Chuckles again). We'll see who's king of the world now.

(Stage lights go down.)

–:: Scene 4 ::–

NARRATOR: As you may have guessed things weren't going well for Jimbo. He got sentenced to prison for a month. He came back thinking he would recite once again at Tellumla Square. However, he got an awful surprise.

(Stage lights are up. Crowd has been listening to a performer this whole time, who happens to be CHUCK)

CHUCK: Hey folks. I think I'm going to end it tonight with one of my favorite poems.

JIMBO: Chuck! Reciting Poetry! What has the world come to?

CHUCK: *Your trying to concentrate, water slides down your hair, drip, drop, plip, plop.* (Making hand like movements associated with his hair). *That's all you can hear in your mind. All by yourself curled up in a corner of a dark room. All motion flies away, you try to follow it, but you fall…broken…static. You can't move. You simply hear the ominous sounds… of the drip.* By your favorite… Me! (Crowd shouts out terms like "Bravo", "Amazing", "More", when suddenly they are interrupted by.)

JIMBO: THAT'S MY POEM!

(All is quite)

CHUCK: Ah. I see my friend Jim has come to join.

RANDOM CROWD MEMBERS: (Saying at different times). What in the world is he doing here! Yeah get lost you freak. You don't belong here.

CHUCK: Relax folks. I mean he just got freed from prison. Or did you escape?

JIMBO: You bastard! (Runs up to him to land him a punch and suddenly stopped by two men)

MAN 1: Don't even think about it man.

MAN 2: Yeah, stay back. You've been sending negative vibes here in Tellumla Square. Why don't you go home?

MAN 1: And stay there. No one needs you here anymore.

CHUCK: Whoa fellas, no need to be hard on my buddy. He has been having a hard time recently, right Jimmy boy? Why don't you guys leave him with me? Thanks again folks.

(Crowd leaves. Lights dim.)

So, Jim, what's on your mind?

JIMBO: What's on my mind? My mind is wondering how in the world you got hold of my poems. The only place I kept them was in my book -

CHUCK: (Takes out book and lighter) - Oh you mean this guy. (Holds lighter right under the book)

JIMBO: Oh my god! Please don't I'm begging you! Please!

CHUCK: You see, Jim, I never really liked you. You think you're so much better than me because you "are a creator", because you can put some words next to each other and make it sound pretty. (Starts to light book on fire)

JIMBO: No! What are you doing?!?

CHUCK: See. There you go again interrupting me. Look, this book doesn't matter to you anymore. (Throws flaming book right in front of him and crushes it). Even if you had that with you in a performance, no one would listen to you. You know why? Because no one cares about you any more. You didn't create anything Jim. You give the crowd the same old crap everyday. You gotta be fresh to keep things alive. Even I know that. I can say the same old crap you give the audience every day and they'll never get tired. You know why, cause I'm fresh. You're old

news Jim. We've all outgrown, you even Patty has. (Starts to walk off. Then stops and chuckles). Look who has the big words now!

–:: Scene 5 ::–

NARRATOR: Ever since that day, Jimbo has been feeling extremely depressed. He locked himself in his own room. He wouldn't come to meals.

(In Jimbo's room. Enter Clarissa.)

CLARISSA: Hey Jim. Look what I've got. Nice warm black bean soup.

(Jimbo groans)

You don't have to act like that. My cooking isn't that bad.

JIMBO: It's not bad at all. It's just I'm not in the mood for black bean soup.

CLARISSA: Recently you haven't been in the mood for anything.

JIMBO: And why does that matter to you?

CLARISSA: Cause you're my brother and I hate to see you like this. (Starts feeding soup).That's why I also made an appointment with the doctor today.

JIMBO: I'm not getting out of the house today.

CLARISSA: Keep telling yourself that.

JIMBO: You're not helping me by doing this. Why can't you just leave me alone?

CLARISSA: Because you're my brother.

JIMBO: That's a pathetic excuse.

CLARISSA: What's your reason for not coming with me? Wait, don't answer that. I know you don't have a good answer. So come.

JIMBO: Why are you so bossy and annoying!

CLARISSA: Because you're my brother.

NARRATOR: As you may have guessed, Clarissa eventually forced Jimbo to come with her to see the doctor. Unfortunately, the doctor didn't see anything wrong with Jim, besides the fact he was suffering from extreme depression. He prescribed medication to Jimbo, but nothing worked.

CLARISSA: (Enters with soup). Jimbo… I think I know what's wrong with you.

JIMBO: No one knows. No one will ever know.

CLARISSA: You've got to go back.

JIMBO: Where?

CLARISSA: You know where.

JIMBO: Impossible! They kicked me out of Tellumla Square. I'm not wanted anymore. You know that!

CLARISSA: A man with curly brown hair, who goes by the name Jimbo, has been kicked out.

JIMBO: I'm seriously not following a thing you're saying.

CLARISSA: (Takes out clothes, mustache and wig). I'm not aware of Tellumla Square kicking out a man with dark black hair and moustache.

JIMBO: A disguise? Still wouldn't work because I don't have my poems. Chuck burned my book.

CLARISSA: You better start writing I guess.

JIMBO: Can you get me some paper and pencils?

CLARISSA: Gladly.

–:: Scene 6 ::–

(Back at Tellumla Square. Crowd has gathered as always. Everyone is excited because a new performer is scheduled today.)

CROWD MEMBER 1: Did you hear? There's supposed to be a new guy today. Poet again.

CROWD MEMBER 2: Another Poet?

CROWD MEMBER 1: Trust me you'll want to stay. He's a foreigner supposedly.

CROWD MEMBER 2: What's his name?

CROWD MEMBER 1: No one knows his identity. Which obviously means this guy is good.

CROWD MEMBER 2: (Saying sarcastically). Obviously. (Turning around and points out a man coming). Hey look he's coming. (Jimbo enter, wearing disguise.)

JIMBO: Hello Tellumla Square. I hope you guys are having a wonderful time.

(Silence)

Okay. I guess I should start…

(Lights dim)

NARRATOR: And what a start it was. Jimbo was back in his groove. People loved his poetry. They gobbled it up like children. He came back over and over again. Jimbo was happy. He was at home. Everything was perfect except for one thing. No one knew who he actually was. So he decided it was time for Tellumla Square to find out. The mask will finally be taken off.

(Back at the square. Crowd has gathered, Jimbo enters.)

JIMBO: Now before I start, many of you have been wondering, "Who am is this guy?" I've actually known you guys longer than you think. (Takes off disguise. Silence). That's right folks. I'm back!

(Another long silence. Then people start to walk out)

Wait! Why are guys leaving? Don't go! Please.

(Everyone has left besides Patricia.)

PATRICIA: You shouldn't have taken your disguise off. You were doing so well. Why'd you have to ruin the show like that?

JIMBO: What did I do! They all loved me during my last few performances.

PATRICIA: That's because they didn't know it was you!

JIMBO: What's wrong with, "me"?

PATRICIA: You're dangerous guy Jimbo. You got arrested remember?

JIMBO: How am I dangerous?!? I hardly did anything and besides I got out of jail didn't I?

PATRICIA: Jim. Don't you understand? There are no "three strikes" in this game of life. There's one, and you've struck out.

JIMBO: Well that's just stupid…you think I'm a good guy right Pat?

PATRICIA: Yeah Jim. You're all right.

JIMBO: Thanks Pat. Hey you busy tonight.

PATRICIA: No I'm free.

JIMBO: Great! Let's go to Eddies. It's been a long time since I've ate there. (Starts to exit. But then notices Patricia's not following. He stops). What? Do you want to go downtown instead?

PATRICIA: Jim I'm not going.

JIMBO: Why not? You said you're free. Come on stop fooling around.

PATRICIA: No seriously Jim. I'm not going to dinner, at least not with you.

JIMBO: What? Why? What's going on Pat?

PATRICIA: Jim. You really are a nice guy, but I can't let you ruin my image. There's too much at stake. I'm sorry.(Runs off stage.)

JIMBO: They've got her too. It's like a sickness… Society. What a bunch of morons! But wait. Maybe it's just me. Maybe I'm the idiot who can't get the rules of the game straight. Chuck was right. I created nothing. None of my words went through anyone. I might as well have been talking to a bunch of dolls - all of them eagerly watching me. Not listening to me, just watching me. All of my words just flew over their heads. My lines just disappeared. As if they were stolen by something.

–:: *The End* ::–

পানশিউলি

অঞ্জলি ভট্টাচার্য

বেশ কয়েক বছর আগের একটি ঘটনা । উত্তর আমেরিকার বঙ্গ সম্মেলনে হাজির হয়েছি । শনিবার দুপুরের দিকে এক সময় অনুষ্ঠান থেকে বেরিয়ে একটা শাড়ীর দোকানে দাঁড়িয়ে পড়লাম হঠাৎ কয়েকটা কথোপকথন শুনে । একজন ভদ্রমহিলা একটা শাড়ী হাতে তুলে দোকানের ছেলেটিকে দাম জিজ্ঞেস করছেন । ছেলেটি দাম বলতেই ভদ্রমহিলা বলে উঠছেন, ''এত দাম চাইছেন ? দেশে এই শাড়ী তো দু-হাজার টাকায় পাওয়া যায় ।'' এই বলে শাড়ীটি রেখে দিয়ে আবার অন্য একটি শাড়ী তুলছেন, তারপর সেই একই কথার পুনরাবৃত্তি । কিছুক্ষণ পরে ছেলেটি বলে ওঠে, ''আপনি শাড়ীটা আমেরিকাতে কিনছেন, দেশের থেকে তো কিনছেন না । দেশে যেতেও তো কত খরচ । এই আমাকেই দেখুন, পাশের চায়ের দোকান থেকে এক ডলার করে এক একটা সিঙাড়া কিনে খাচ্ছি । একটা সিঙাড়া ৫০ টাকায় কিনতে আমার কেমন লাগছে বলুন তো? সকাল থেকে দু তিনশো টাকার সিঙাড়াই খেয়ে ফেল্লাম ।'' ভদ্রমহিলা একটুও লজ্জিত না হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, ''আসলে কি জানেন, ছোটবেলায় পাড়াগাঁয়ে বড় হয়েছি । এত বছর এ দেশে থেকেও মন খুলে খরচ করতে পারিনা । সবই মনে হয় অপচয় । আমাদের গ্রামের লোকেরা কি ভাবে দিন কাটায় সব তো দেখেছি ।'' আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনাদের গ্রামের নাম কি ?'' ভদ্রমহিলা বললেন, ''গ্রামের নাম পানশিউলি, হুগলী জেলায় । আমাদের গ্রামটা রূপনারায়ণ আর মুন্ডেশ্বরী নদী যেখানে মিশেছে তার মাঝখানে ।'' আমি গ্রামের নামটা শুনেই চমকে উঠলাম । গত পরশুই তো আনন্দবাজার অন-লাইনে পড়লাম পানশিউলি গ্রামটি ক্রমশঃ রূপনারায়ণের মধ্যে তলিয়ে যাচ্ছে । গ্রামের লোক সংখ্যা পাঁচ হাজার থেকে এখন দু হাজারে । রাতের অন্ধকারে জল এসে ভাসিয়ে দিচ্ছে । বেশির ভাগ লোক গৃহহীন হয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেলেও ওখানের বাসিন্দারা বলছেন বেশ কিছু লোকের প্রাণ ওই নদীর মধ্যেই বিলীন হয়েছে ।

আমি কি বলব বুঝতে পারছিলাম না । ভদ্রমহিলাকে জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনার নাম কি?'' উত্তর এলো, 'শাশ্বতী বসাক' । আমার নামও বললাম । তারপর জিজ্ঞেস করলাম, ''আচ্ছা, আপনাদের গ্রামের নাম পানশিউলি কি ভাবে হয়েছে?'' শাশ্বতী বোধহয় এই প্রথম একজনকে পেলেন যে তাঁর গ্রামের ব্যাপারে কিছু উৎসাহ দেখিয়েছেন । বললেন, ''সঠিক জানা নেই, তবে কেউ কেউ বলেন নদীর ধারে ধারে মাঝিদের মাটির ঘরের সামনে কেউ একজন অনেক শিউলি গাছ লাগিয়েছিলেন । আর বর্ষার সময় পানকৌড়িরা নদীর পাড় ধরে ঘুরে বেড়াতো বলে দুয়ে মিলে নাম পানশিউলি। আবার কিছু লোক বলেন এক সময় এ গ্রামে প্রচুর পানের চাষ হোতো । আর শিউলি তো ছিল-ই ।''

আমি এবার সাহস করে শাশ্বতীকে জিজ্ঞেস করলাম, ''আচ্ছা আপনাদের আত্মীয়স্বজন এখনো কি গ্রামেই থাকেন?'' উত্তর দিলো, ''দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন তো অনেকই আছে । আমার মা ও দুই ভাই ওখানেই থাকে । আমার গ্রামের ছোটবেলার কত যে সুন্দর স্মৃতি আছে বলে শেষ করতে পারবোনা । আপনার বাড়ী কোথায়?'' আমি বললাম, ''কলকাতায়, তবে আমার শ্বশুর বাড়ী বর্ধমানের গ্রামে, আমার husband ছোটবেলায় গ্রামেই কাটিয়েছেন । আপনি আমার husband এর সাথে কথা বললে হয়তো অনেক কিছু মিল খুঁজে পেতেন ।'' শাশ্বতী হঠাৎ বলে উঠলেন, ''আপনি এই প্রথম যিনি বললেন আপনার husband গ্রামে বড় হয়েছেন । আমি অনেক লোককে জানি যাঁরা পাড়াগাঁয়ে বড় হয়েছেন, কিন্তু জিজ্ঞেস করলেই বলেন কলকাতা । বাংলার গ্রামগুলো যে কত সুন্দর, কত কি দেখার আছে সেখানে, শুধু প্রচারের অভাবে তারা আসল মর্যাদা পায়না ।'' আমি বললাম, ''ঠিকই বলেছেন । বাংলার সংস্কৃতি এখনো গ্রামগুলোই ধরে রেখেছে, যার অনেক কিছুই শহরে দেখা যায়না।''

আমি শাশ্বতীকে জিজ্ঞেস করলাম, ''আপনার মা ও

ভাইদের সাথে কি ভাবে যোগাযোগ করেন? ওখানে কি ফোন আছে ?'' শাশ্বতী বললেন, ''না, বাড়ীতে ফোনের লাইন নেই, তবে আমার বড় ভাই-এর একটা সেল ফোন আছে। বেশ কিছুদিন ধরে বারবার চেষ্টা করেও ফোনে ওদের পাচ্ছিনা। কি ব্যাপার কে জানে।'' আমি তখন আর না বলে পারলাম না, বললাম, ''আপনি কি আনন্দবাজার অন-লাইনে পড়েন?'' শাশ্বতী বললেন, ''না, কেন বলুন তো?'' আমি বলে ফেললাম, ''আমার মনে হচ্ছে আপনাদের গ্রাম সম্বন্ধে আমি কিছু একটা পড়েছি আনন্দবাজারে। ঠিক মনে পড়ছেনা, তবে নদী সংক্রান্ত একটা ব্যাপার। আপনি বরঞ্চ internet-এ গিয়ে গত কালের আনন্দবাজার পড়ে দেখুন।'' আমার কথা শুনে শাশ্বতী অস্থির হয়ে পায়চারি করতে শুরু করলেন। আমিও ওর সাথে হাঁটতে থাকলাম। বললাম, ''আমি খুব sorry, আপনাকে এরকম অস্বস্তিতে ফেললাম।'' ''অস্বস্তি আমার কয়েকদিন ধরেই রয়েছে, এখানে এসেও শান্তি পাচ্ছিনা,'' শাশ্বতীর উত্তর। আমি বললাম, ''বেশী অস্থির হবেন না, মাথা ঠান্ডা করে যা করার করবেন। আপনার ফোন নম্বরটা আমাকে দিন। আর আমার নম্বরটা এই কার্ডে লেখা আছে। ওঁদের খবর পেলে আমাকে একটা ফোন করবেন।'' এই কথা বলে আমি ওখান থেকে চলে এলাম। NABC শেষ হয়ে গেলে বাড়ী ফিরে এলাম। শাশ্বতীর কথা রোজই মনে হয়। বেচারা কি খবর পেলো কে জানে। আমাকে ফোন করার কথা হয়তো ভুলেই গেছে।

প্রায় সপ্তাহ দুয়েক কোনো খবর না পেয়ে শেষে আমি শাশ্বতীদের বাড়ীতে ফোন করলাম। ফোনে গুরুগম্ভীর গলার হ্যালো শুনে বুঝলাম শাশ্বতীর স্বামীই হবেন। বললাম, ''আমার নাম অঞ্জলি ভট্টাচার্য, শাশ্বতীর সঙ্গে কথা বলতে পারি?'' ভদ্রলোক বললেন, ''আপনার কথা শাশ্বতী আমায় বলেছে। আমার অফিসে নানারকম ঝামেলা চলছে, তাই শাশ্বতীকে একাই দেশে যেতে হ'ল। কলকাতায় গিয়ে ওর মামারবাড়ীতে উঠেছিল। কিন্তু ওরাও কোনো খবর না পাওয়ায় শাশ্বতী একাই গ্রামে যাওয়ার ঠিক করে। আমি একা যেতে বারণ করেছিলাম, কিন্তু ও কোনো কথাই শোনেনা। আজ এক সপ্তাহ হ'ল পানশিউলি গেছে। তারপর থেকে আর কোনো খবর নেই। আমি আগামী কাল কলকাতায় রওনা হচ্ছি।'' আমার কথা বন্ধ হয়ে গেলো; কোনরকমে, ''আপনারা ভালো ভাবে ফিরে আসুন,'' এই বলে ফোন রেখে দিলাম।

বললে না খুলে

অলক ভট্টাচার্য

বাসন্তী আজ কেয়াকে বলে ফেললে
পল্লব নাকি আগের মতো কিস করেনা ।
কেয়া চোখ দুটো গোল করে ঘুরিয়ে
বাসন্তীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলে ।
বললে, তা তুই কেন করিসনা?

অর্নব তোকে আগের মতো কিস করে?
বললে বাসন্তী প্রশ্নের সুরে ।
তোর কি হয়েছে রে বাসন্তী?
নে চা টা তুলে ঠান্ডা হয়ে যাবে ।
'পল্লবের কিসের মতো' কথাটা মনে এলেও
কেয়া বললে না খুলে ।

মায়ের বয়েস আশি
ভাবছি যাই দেশে, ঘুরে আসি ।
মনে হয় শেষ দেখা, চিন্তিত বাসন্তী
অবশ্য পল্লব যাবেনা দেশে ।
'ভালোই তো' কথাটা মনে এলেও
কেয়া বললে না খুলে ।

কেয়া চোখ বন্ধ করে —
গরম চায়ের থেকে গরম
পল্লবের চুম্বন এখনো তার ঠোঁটে, কপালে!
একথা সে একদিন বাসন্তীকে
বলবে কি করে খুলে?

Tsar-জ সন্তান

অলক ভট্টাচার্য

Dr. Vladimir আমার সাথে
লাগিয়ে দিলো বিরাট তর্ক,
তার মতে বিশাল মহান রাশিয়া
আর ভারতবর্ষ, বানের জলে আসিয়াছে ভাসিয়া ।

আমি বলি তোমরা না পশ্চিম না পূর্ব
না ইউরোপ না এশিয়া,
শুধু প্রজা নির্যাতন করো বসিয়া বসিয়া ।
Vladimir ফোঁস করে - তোমাদের দেশে
ঘরে বাইরে জলে খাদ্যে সব ব্যাক-টিরিয়া ।

আমি বলি একে একে ভারতের পাঁচ হাজার
বছরের ক্রমাগত ঐতিহ্যের উৎকর্ষ,
Vladimir বলে দেখে এসো মিউসিয়াম হার্মিটেজ
পাবে আমাদের Tsar বংশের
শৌখিন সম্ভারের স্পর্শ ।

আমি বলি Tsar-জ সন্তান তোরা
পূর্ব পুরুষের ঐতিহ্য বুঝিবি কি করিয়া?

না যেওনা, তুমি-ই যেওনা

ব্রজেন আগরওয়ালা

সেদিন বোধ হয় রোববার, দুপুর বেলায় নিউইয়র্ক জায়ান্ট আর শিকাগো বেয়ারস এর ফুটবল প্লে-অফ গেম। খেলা দেখতে দেখতে দিলিপ খুব এক্সাইটেড, কখন যে রিয়া এক কাপ হট-চকলেট দিয়ে গেছে লক্ষ্য করেনি। কিছুক্ষণ পর রিয়া কাছে এসে জিগ্যেস করল, কেমন হয়েছে হট চকলেটটা? এবার আমি তোমার জন্য, একটু অন্যভাবে তৈরী করেছি টিভির শোতে দেখে। কাপটা দাও ধুয়ে উঠিয়ে রাখি।

দিলিপ তাকিয়ে দেখে কাপটা পাশেই আছে হট চকলেট খাওয়া হয়নি। কাপে চুমুক দিয়ে দেখে হট চকলেট ঠান্ডা হয়ে গেছে। খেতে আর ভাল লাগলনা।

রিয়া আমি খেলা দেখতে দেখতে বুঝতে পারিনি কখন তুমি হট চকলেট দিয়ে গেছ। তখন একটু বলে গেলেই তো পারতে।

আর কত জোরে বলবো। আজকাল তো আমি পুরনো হয়ে গেছি। আমার কোন কথা তুমি শুনতেও পাওনা আর আমাকে দেখতেও পাওনা। এবার একটা বুল হর্ন কিনে রাখবো তোমার সাথে কথা বলার জন্য — কেমন!

দাওনা একটু গরম করে — প্লিজ।

রিয়া কাপটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে বলল — এবার খেলা ছেড়ে উঠে হট চকলেটটা তুমি মাইক্রোওয়েভে গরম করে নাও। আমি আর তোমার সাথে পারিনা।

তারপর একটু ব্যঙ্গ করে বলল, এবার থেকে খেলা দেখার সময় চা কফি তৈরি করে নিয়ে এসে পাশে বসে থেকে আমি তোমাকে খাইয়ে দেব কেমন।

দিলিপ বুঝতে পারে রিয়া খুব অসন্তুষ্ট। একটু হেসে বলল, বস আমার পাশে, দুজনে খেলাটা দেখি। খুব ভাল লাগবে। এটা প্লে-অফ গেম খুব এক্সাইটিং, এস পাশে বস আমি তোমাকে খেলাটা বুঝিয়ে দিচ্ছি।

— কেন যে শুধু সোফায় শুয়ে এই মারামারি খেলা গুলো দেখ বুঝতে পারিনা। মনে আছে? আগে আমরা কত কাজ একসাথে করতাম। আর প্রত্যেক রোববার বিকেলে বেড়াতে যেতাম। আমাদের দুজনের কমন ইন্টেরেস্ট গুলো যেন হারিয়ে ফেলেছি আমরা, জান? তুমি তো আমাকে বলেছিলে কমন ইন্টেরেস্ট গড়ে তুললে দাম্পত্য জীবন সুখী হয়। তুমি খুব পাল্টে গেছো। আমাকে বোধ হয় আর ভাল লাগে না, তাই না?

— কি যে বল, তুমি তো আমার সব। তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে। আমি জানি তুমি খুব অভিমানী। এস আমার পাশে বসে মাথাটা একটু ঠান্ডা কর। কিছু মনে করোনা প্লিজ খুব ভুল হয়ে গেছে। চেষ্টা করবো আর যেন এরকম না হয়। থ্যাঙ্কউ ফর দা হট চকলেট।

রিয়াও অনেক সময় দিলিপের কথায় খেয়াল রাখেনা। এইতো কয়েকদিন আগে ওকে বলে রেখেছে দেশ থেকে এক বন্ধু এসেছে ওর সাথে দেখা করতে দুজনে যাবে, ঠিক সেই দিনই রিয়া প্ল্যান করে রেখেছে রেডিও সিটি মিউজিক হলে শো দেখতে যাবে। মেয়েদের সাথে কি পারা যায়। দিলিপকে বন্ধু দর্শন সেদিন বাদ দিতে হয়েছিল।

আগে ওরা এরকম ছিলনা। একসময় ওরা একে অপরের জন্য সব ত্যাগ করতে পারতো। সেসব বিয়ের বছর দুয়েক আগে আর বছর দুয়েক পরের কথা। দিলিপ ঠিক বুঝতে পারেনা কেন ওদের এত পরিবর্তন এসেছে। মেডিক্যাল কলেজেই ওদের প্রথম পরিচয়, রিয়া দুবছরের জুনিয়ার। কলেজ রি-ইউনিয়নে ওদের আলাপ। দুজনেই রি-ইউনিয়নে কমিটি মেম্বার ও কর্মী। সেই থেকেই ওদের বন্ধুত্ব। প্রথম আলাপ ধীরে ধীরে বন্ধুত্বে বদলেছিল। বন্ধুত্বের পথ ধরে এসেছিল প্রেম ও পরিশেষে সাত পাকে বাঁধা পড়া। সে আজ তিন বছর হয়ে গেল, আর বিয়ের আগের হিসেবটা ধরলে প্রায় পাঁচ বছর। বিয়ের প্রথম দুটো বছর স্বপ্নের ঘোরেই আর শুধু একটা অনাস্বাদিত অজানা স্রোতে কেটে গেছে।

দুজনেই রেসিডেন্সি ট্রেনিং শেষ করে নিউইয়র্ক সিটিতে চাকুরী করে। এবার সেই ছোট্ট এক বেড রুম ফ্ল্যাটটা ছেড়ে ওরা একটা চার বেডরুমের খুব বড় বাড়ি কিনেছে। ওরা দুজনে খুব খুশী। একদিন ছোট্ট সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করে গৃহ প্রবেশ করে। সেই রাতটা ওদের নতুন বাড়িতে ঘুমাতে বলেছেন পুরোহিত মশায়। ঘুমাতে যাওয়ার আগে ওরা দুজনে ঘুরে ঘুরে দেখে বড় বাড়িটা। খুব ভাল লেগেছিল। বাড়িতে ফার্নিচার নেই তাই মেঝেতেই চাদর পেতে দুজনে ঘুমিয়েছে। কথা বলতে বলতে দিলিপ কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছে রিয়া খেয়াল করেনি। রিয়ার কিন্তু ঘুম আসে না, শুধু ভাবছে বাড়িটা কিভাবে সাজাবে। শুয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়ে রিয়া স্পর্শ করে ছিল নতুন টাইলস বসানো মেঝে। সর্বাঙ্গে কেমন এক শিহরণ বোধ হয়েছিল। রিয়ার মনে পড়েছিল প্রথম মিলন রাতের কথা। সেদিন রিয়ার সমস্ত আবেগ ছিল দিলিপকে নিয়ে, আজ সব আবেগ দলা পাকিয়েছে এই নতুন আবাসটাকে নিয়ে। সকালে ঘুম থেকে উঠে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে রিয়া মজা করে খুব হেসে বলেছিল, এত বড় বাড়িতে কে থাকবে? আমরাতো মাত্র দুজন।

কেন একটা গেষ্ট রুম আর বাকি দুটো আমাদের ভবিষ্যতের ছোট্ট দুটো নতুন অতিথিদের জন্য। তবে আর বেশী দেরী কোরনা, অনেক বয়স হয়ে যাচ্ছে। এবার থেকে আমার কথা না শুনলে দুজনকে দুঘরে ঘুমতে হবে কেমন? — সে আবার কি। দুর। তা হয় নাকি? মনে আছে, কত কষ্ট করে আমি তোমার মন জয় করে, তোমাকে পেয়েছি। বিয়েটা-তো তোমার বাবা প্রায় ভেঙ্গেই দিয়েছিলেন। ভাগ্যিস তোমার মা রাজী ছিলেন। তোমাকে এ কথাটা কোনদিন বলিনি — বিয়ের পরের দিন সকালে মা এক কাপ চা নিয়ে এসে আমাকে বলেছিলেন দিলিপ জান, সকলে খুব অবাক তুমি এত ভাল বাংলা বলতে পার আর তোমার কথায় কোন এ্যাক্সেন্ট নাই। সকলের ধারণা তুমি হিন্দি ভাষী। মালাবদল করে, অগ্নিসাক্ষী রেখে, শপথ নিয়ে, সাতপাকে ঘুরে সিঁথিতে সিন্দুর পরিয়ে বিয়ে করেছি, এখন নিয়ম ভাঙলে কি শাস্তি হবে জানো?

— কি শাস্তি?

তুমি ভাল ভাবেই জানো তখন অজুহাত দিলে আমি আর শুনবো না।

এভাবে ওদের দিন গুলো বেশ ভালভাবেই কেটে যায়। এখন দুজনেই ট্রেনিং শেষ করে নতুন কাজ শুরু করেছে। ওদের আরও বড় সংসার গড়ে তোলার কল্পনা।

একদিন রিয়া ওর রাঙ্গামাসির চিঠি পেল দেশ থেকে। ওঁর মেয়ে সুনিতা নিউইয়র্ক ইউনিভারসিটিতে আসছে পি. এইচ. ডি. করতে। মাসি লিখেছে সুনিতা ওদের কাছে মাসখানেক থাকতে চায়। রিয়া চিঠিটা নিয়ে খুব খুশি হয়ে দিলিপের কাছে ছুটে এসে চিঠিটা দেখিয়ে বলেছিল, জান সুনিতা এলে আমার খুব ভাল লাগবে, ওর সাথে আমার অনেক দিন দেখা হয়নি। ও খুব মিশুকে। আমাদের বিয়েতে আসতে পারেনি ওর পরীক্ষা ছিল। তুমি বোধ হয় ওকে দেখনি। দেখতে খুব সুন্দরী আর খুব মিষ্টি। কি বল, মাসিকে তাহলে বলে দিই আমরা খুব খুশি হব সুনিতা আমাদের কাছে এসে থাকলে? ঠিক আছে, তুমি খুশি হলেই আমি খুশি।

কিক্ষুদিন পরে সুনিতা নিউইয়র্কে এলো। ক'দিন খুব হই হই করে কেটে গেল। রিয়া একদিন বলল, দিলিপ তুমি কয়েকটা দিন ছুটি নিয়ে সুনিতাকে নিউইয়র্ক সিটি দেখিয়ে দাও। আমার এখন ছুটি পাওয়ার অসুবিধে আছে। দিলিপ দশ দিনের ছুটি নিয়ে টাইম স্কোয়ার, সেন্ট্রাল পার্ক, এম্পায়ারস্টেট বিল্ডিং, ইউনাইটেডনেশন, স্ট্যাচু অফ লিবেরটী, রেডিও সিটি মিউজিক হল, ব্রঙ্কস জু সব দেখিয়ে বাড়ি ফিরতে প্রতিদিন সন্ধ্যে হয়ে যায়। সুনিতা খুব এনজয় করে দিলিপের সঙ্গে। সন্ধ্যেই বাড়ি ফিরে দিদির কাছে গল্প করে সারাদিন কোথায় কি দেখল, কোন রেস্তোরাঁতে কি খেয়েছে, জামাই-দা খুব মিশুকে আর খুব গল্প করতে ভালবাসে। সব নিয়ে খুব প্রশংসা করে জামাইদার।

এখন সকাল থেকে সন্ধ্যে সুনিতার সাথে নিউইয়র্কে বেড়াতে যাওয়াটা দিলিপের নিত্যকার কাজ হয়ে গেছে। একদিন লিঙ্কন সেন্টার থেকে ফিলাডেলফিয়া অরকেস্ট্রা সো দেখে ফিরে আসতে বেশ রাত হয়ে গেছিল।

কয়েক দিন ধরে দিলিপ লক্ষ্য করছিল রিয়ার আগের সেই উচ্ছলতা যেন কোথায় হারিয়ে গেছে। রাতে বিছানায় এসেই ঘুমিয়ে পড়ে। কথাবার্তায় কোন যোগ দেয় না।

এমন কি দেহটাও যেন সাড়া দিতে ভুলে গেছে। — এখন ছাড়, আমার ঘুম পেয়েছে, আমার গলায় লাগছে, নিশ্চয়ই আজ শেভ করনি।

তোমার কি হল? শরীর খারাপ হয়নি তো?

তবু ভাল আমার দিকে নজর পড়লো।

কেন? তোমার দিকে নজর পড়বে না তো কার দিকে পড়বে?

সেতো তুমি বেশ ভালভাবেই জান। আজকাল তো আমার দিকে নজর দেওয়ার সময় পাওনা। ইঙ্গিতটা খুব স্পষ্ট করেই দিলিপ বুঝতে পারে। একটু হেসে বলে এই কথা, বেশ তো কাল থেকে তুমিই সুনিতাকে ওর কলেজ ক্যাম্পাসে রেজিস্ট্রেশন আর হাউসিং এর জন্য নিয়ে যেও কেমন। তুমিই তো বলেছিলে ওকে নিয়ে নিউইয়র্ক সিটি দেখাতে আর ওর সব কাজ করে দিতে।

এখন থামো। আমি বলিনি ২৪ ঘন্টা ওকে নিয়ে ঘুরতে।

দিলিপ আর কথা বাড়ায় না। মনে হচ্ছে কোথায় যেন মনের তার ছিঁড়ে গেছে, ছোটবেলায় সেই গীটারটার মত — আর ভাল বাজেনা। দুজনের মনের ছন্দটা যেন আর মিলছেনা।

দিলিপ ছুটিটা বাতিল করে কাজে ফিরে গেল। সুনিতাকে বলে গেল তোমার দিদি তোমাকে নিয়ে যাবে ক্যম্পাসে হাউসিং আর রেজিস্ট্রেসনের জন্য। দিদি সব সাবওয়ে চেনে তোমার কোন অসুবিধে হবে না।

সুনিতার ডরমিটরি ঠিক হয়ে গেছে, এক সপ্তাহ পরে সে চলে গেল ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসে।

এর মধ্যে দিলিপের একটা ভাল চাকুরীর সুযোগ এসেছে। শিকাগোর এক ইউনিভারসিটি হাসপাতাল থেকে। রিয়ার কথা চিন্তা করে ও একটু সময় চেয়েছে কন্ট্রাক্ট সাইন করার।

এখন রিয়ার মধ্যেও একটা পরিবর্তন এসেছে। দিলিপের কোন চিঠি, ইমেল-ফেসবুক বা ফোন এলে রিয়া দেখতে চায় কার লেখা ও কার গলা। কোন মহিলা ফোন করলে জানতে চায় নাম ধাম আর কি কারণে ফোন সবকিছু। এমন কি অফিসে ফোন করে খোঁজও নেয় দিলিপ কোথায়।

সেদিন জানলো দিলিপ হাসপাতালে যায়ইনি। বাড়ি ফিরতেই জিগ্যেস করলো আজ হাসপাতালে যাওনি কেন? তুমি কি করে জানলে?

না জানাবার মতলব ছিল বোধ হয়? কার সাথে ছিলে? রিয়া আমি এখন খুব ক্লান্ত। এখন ঘুমোতে যাচ্ছি।

আমি বাইরে খেয়ে এসেছি রাতে আর খাবনা।

— নিশ্চয়ই তোমারা দুজনেই খুব ক্লান্ত, তাই না?

কথাগুলোর রহস্য বুঝতে পারলেও দিলিপ কথা বারায় না। সত্যিই সে খুব ক্লান্ত সারাদিন কাজ আর সন্ধেয় মিটিং শেষ করে। রিয়ার মধ্যে এই পরিবর্তন দেখে দিলিপ খুব অবাক। ঠিক বুঝতে পারেনা কি করে ওর ভুল ধারণা কাটাবে। রিয়াকে তো ও খুব ভালবাসে, রিয়া ওকে সব দিয়েছে। কোনদিন কোন অভাব ফিল করেনি। রিয়াকে নিয়েইতো ও ভবিষ্যতের জাল বুনেছে। কিছুতেই ও রিয়ার সাথে এখন আর যোগাযোগ করতে পারছে না। খুব ইচ্ছে সেই পুরনো দিনগুলো আবার ফিরে পেতে।

সকালে চা খেতে রিয়াকে বলল — ভাবছি আমি শিকাগোর চাকুরিটা নেব, তোমার কি মত? — কোন উত্তর দেয় না রিয়া।

প্রথম প্রথম তোমার একটু অসুবিধে হবে, চট করে তোমার চাকুরিটা ছাড়াতে চাই না। শিকাগোতে সেটেল করে তোমার একটা চাকুরির ব্যবস্থা করবো। ডাক্তারদের তো প্রচুর জব অপরচুনিটি। কোন অসুবিধে হবে না আর বেশী সময়ও লাগবেনা। রিয়া এবারও কোন উত্তর দেয় না।

সেদিন বাড়ি ফিরে দিলিপ জানাল আমি শিকাগোর চাকরিটা নিয়েছি। আগামী জুলাইয়ের দশ তারিখে ইউনাইটেড এয়ার লাইনে সকাল আটটায় আমার ফ্লাইট।

এইভাবে বেশ কয়েকদিন কেটে যায়। বাড়িটা যেন একটা ভারী কুয়াশায় ঢেকে আছে। কোন কিছুতেই মন বসে না। দুজনেরই মন খারাপ কিন্তু কেউ কাউকে মনের কথা প্রকাশ করতে পারছে না। — কি ভীষণ বিমর্ষতা। শুধু মনে হচ্ছে যেন শ্রাবণের কালো মেঘ ঝুলে আছে এই বিশাল বাড়িটায়, জমে আছে কত কথা, আর দুজনে আজ বসে আছে একা একা। কিছুদিন পরে রিয়া দিলিপকে জানালো ওরও একটা জব অফার এসেছে লস এঞ্জেলস থেকে। জুলাইয়ের দশ তারিখে সকাল ৮ টায় ইউনাইটেড এয়ার লাইনে ওর ফ্লাইট।

দিলিপ ভাবল এটা বোধ হয় ভাল হল। মনে হল এই নিউইয়র্ক থেকে ওদের দুজনের মনের ছাপ মুছে যাক।

নতুন জীবন শুরু হবে ওদের দুজনের । কিন্তু মনটা খুব খারাপ, যেন একটা ভারী বেদনা ওর বুকের উপর চেপে বসে আছে। শুধু মনে হচ্ছে যতই মনমালিন্য হোক, রিয়ার উপর ওর ভালবাসা এখনও খুব । ওকে ভালবেসে বিয়ে করেছে, খুব খারাপ লাগছে ওকে ছেড়ে যেতে । অফিস থেকে আসার পর একসাথে দুজনে চা খেতে খেতে দুজনেরই মনে হয় যেন অন্যজন কিছু বলতে চায় কিন্তু কেউ কিছু বলতে পারে না ।

এখন রিয়ার মনে হচ্ছে হয়ত এতদিন ভুল করে এসেছে । যা নয় তা কল্পনা করে সে নিজেও যেমন কষ্ট পেয়েছে আর দিলিপকেও তেমন কষ্ট দিয়েছে । এটা কেন সে আগে ভাবিনি । তাহলে হয়তো এই সাজানো ফুলের বাগানটা ভেঙ্গে যেতোনা । এখনও কিছুতেই দিলিপের সাথে যোগাযোগ করতে পারছে না, মনবীণার তারটা তো ছিঁড়ে গেছে।

দেখতে দেখতে দুজনের যাবার দিন এলো । ট্যাক্সি করে দুজনে লাগোরডিয়া এয়ার পোর্টে এসেছে । বোর্ডিং পাস নিয়ে সিকুইরিটি ক্লিয়ার করে ঘন্টা খানেক সময় আছে । দুজনেই পাশাপাশি বসে নীরবতায় ১৫ মিনিট কাটলো । রিয়া জিগ্যেস করলো এই, কফি খাবে? আমি নিয়ে আসছি স্টারবাক্স থেকে কফি ও তোমার প্রিয় কুকি । রিয়া আমার জন্য ব্ল্যাক কফি এনো ।

— হ্যাঁ আমি জানি তুমি ব্ল্যাক কফি ভালোবাসো । গরম কফি কাপে চুমুক দিতে দিতে রিয়ার মনে হল তার মনের ভেতরের অনেক অব্যক্ত বেদনা যেন গলে যাচ্ছে । তখন গেট থেকে ঘোষণা করছে — বোর্ডিংএর জন্য ।

দিলিপ বলল রিয়া তোমার বোর্ডিংএর সময় হয়ে এসেছে । লস এঞ্জেলেসে পৌঁছে ফোন করে দিও কেমন । হ্যাব এ সেফফ্লাইট, আই লাভ ইউ । আই উইল মিস ইউ রিয়া । ভাল থেক । রিয়া আর নিজেকে সামলাতে পারল না, কেঁদে ফেলল । শাড়ীর আঁচলে চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, দিলিপ আমি লস এঞ্জেলেসে যাচ্ছি না, প্লিজ মনে কিছু করোনা, আমি তোমার সাথে শিকাগো যাচ্ছি তোমার সাথে থাকতে । আমি তোমাকে ছেড়ে কিছুতেই থাকতে পারবো না ।

দিলিপ তো প্রথমে খুব অবাক । তারপর খুব জোরে হেসে উঠে বলল — আমি তো শিকাগো যাচ্ছি না, আমি ফ্লাইট বদলেছি, আমার টিকিট লস এঞ্জেলসের, আমিও তোমার সাথে থাকতে চাই । তোমাকে ছেড়ে আমিও কিছুতেই থাকতে পারবোনা । দুজনেই খুব হেসে দুজনকে জড়িয়ে ধরে, এতদিনের অভিমান আর দুঃখ ভুলে । একটু সময় নিয়ে রিয়া বলল, জান একটা খুব ভাল খবর আছে । এর থেকে আর কি ভাল খবর হতে পারে?

আরও অনেক ভাল খবর । কি খবর? জানো আমাদের সংসারে একটা ছোট্ট অতিথি আসছে আট মাস পরে ।

— দিলিপ আরও জোরে রিয়াকে জড়িয়ে ধরে সিঁদুরে রাঙা সিঁথিতে চুমু দিয়ে খুব এক্সাইটেড হয়ে বলল, — চল শিগগির বাড়ি ফিরে যাই, নতুন অতিথির ঘরটা খুব ভাল করে সাজাতে হবে । আর ডাক্তারের সাথে তোমার জন্য খুব শিগগির একটা এপইন্টমেন্ট করতে হবে । অনেক কাজ । ফুটবল খেলা দেখে আর সময় নষ্ট করবো না, তোমায় কথা দিলাম । বাড়ী ফেরার পথে ট্যাক্সিতে সমস্ত রাস্তা রিয়া দিলিপের হাত আরও জোরে ধরে রইল ।

আমার গল্পটাও ফুরল ।

মনের মানুষ

বানী ভট্টাচার্য্য

'মালা এবার একটু বসি এই গাছটার তলায় — কত তো হাঁটলাম এতক্ষণ ধরে। এই ষাটবছর বয়েসে আমার কি আর এত হাঁটার শক্তি আছে?'

'কেন পারবে না? প্লিস, এসো এখানে। দেখো এই গাছটা, আর কি সুন্দর লাল লাল ফুলগুলো গাছটাতে। সাদা যে ফুলটা আমার মাথায় একটু আগে পরিয়েছো, ওটার বদলে লালফুল পরিয়ে দাও না, প্লিস', মালা বলে উঠলো মধুর কণ্ঠে।

'সাদা গোলাপটাতেই তো তোমাকে বেশী ভালো লাগছে, তাছাড়া এই লাল ফুলগুলো তো অনেক ছোটো, কেন তুমি বুঝতো পারছো না মালা ?' রথীনও নরম গলায় বললো।

'আচ্ছা, তাহলে লালগুলো সাদার পাশেই দাও, কিন্তু আমার লাল ফুল চাই-ই। কারণ আমি জানি, আমাকে লালফুল বেশি মানায়।'

'কি করে জানলে? আচ্ছা দিচ্ছি,' বলে একটু মিষ্টি হেসে রথীন আদর করে মালাকে জড়িয়ে ধরলো।

মালা বললো, 'অজয় তো বলতো, লালটাই বেশী মানায় আমায় !'

রথীন তখন মালাকে আদর করতে এতই ব্যস্ত যে শুনেও যেন শুনলো না ওর কথাগুলো।

রথীনের বউ গত হয়েছে আজ প্রায় তিন বছর হলো। রথীন খুবই ভালোবাসতো নীলাকে। কিন্তু ভগবানের দ্বারে যাবার যার যখন দিন আসে ! তাই ক্যানসার ধরা পড়বার কিছুদিন পরেই তিনি টেনে নিলেন নীলাকে নিজের কাছে। রথীনের খুবই একা একা লাগতো বউকে হারিয়ে। নীলার সব কথাই রথীন মেনে নিতো। কোনো মনমালিন্য ওদের মধ্যে ছিল না। তাই রিটায়ার করার পরে দেশে দেশে ভ্রমণ করে বেড়াতো রথীন। টাকা পয়সার তো কোনো অভাব নেই রথীনের।

শিলিগুড়ির এক পর্বতে এক ভ্রমণের মাধ্যমেই মধ্যবয়সী মালার সাথে দেখা রথীনের। মালা বেশ কিছুটা বয়েসে ছোটো রথীনের থেকে। হাসি কৌতুকে মিশোনো এক অপূর্ব মেয়ে সে। রথীনের জীবনে দেখা দিয়ে এক অন্যরকমের সুখ আর আবেগ এনে দিল মালা। মালার স্বামী অজয় আজ বছর দুই হলো মারা গেছে। অনেক টাকাপয়সা এমনকি লাইফ ইন্সিওরেন্সেরেও টাকা পেয়ে মালা এখন বড়োলোকের দলে পড়তে পারে। মালার এক ছেলে। বস্টনে পড়তে গিয়ে ওখানকার এক মেয়েকে বিয়ে করে ওখানেই সংসার পেতেছে। মালাও তাই দেশে দেশে ঘুরে বেড়ায় আর তাতেই সময় কাটে তার। কথায় কথায় বলেছে রথীনকে একদিন মালা, অজয়ও দেশ ভ্রমণ করতে ভালোবাসতো। এখন একেবারে যেন মালা আর রথীনের জীবনের একই পথ, আর দুজনেরই দুজনের প্রতি চুম্বকের মত আকর্ষণ ।

অল্প পরিচয়ের পরেই মালাকে কেমন যেন নিজের মনে হল রথীনের। প্রথম দেখার দিনই মালা বলেছিল 'আমার আপনাকে দেখে মনে হয়েছিল যেন আমার স্বামী আমার কাছে ফিরে আসলেন।' সেদিন এই রিমার্কটা রথীনের আশ্চর্য্য লাগলেও কেমন যেন ভালো লেগেছিল।

বহু জায়গা দেখে দুজনেরই এরকম করে একটা বছর কেটে গেল। রথীনের মনে হয় কতদিন ধরেই না জানি দুজনের দুজনকে চেনা। যেন রথীনকে পেয়ে হাসিখুশী মালা স্বর্গে স্থান পেয়েছে। মালাই ঠিক করে, কোথায় যাবে আর কখন যাবে। রথীনের ভালোই লাগে কারন ওকে কিছু চিন্তা করতে হয় না। জায়গাগুলো সবই কিন্তু মালার আগেই দেখা। যেখানেই ওরা যায় মালা গল্প করে ওর স্বামীর, এমনকি হোটেলগুলোতেও ওরা আগে এসে থাকতো। রথীন আর মালা হোটেলে দুজনে পাশাপাশি ঘরে থাকে। বিকেলে খাওয়ার টেবিলে মালা, রথীন কি খাবে সেটাও ঠিক করে দেয়। রথীন তৃপ্তি করেই খায়, এমনকি মালার পছন্দের তারিফও করে। মালার পাশে থেকে থেকে, মালার স্বামীর

কথা শুনে শুনে, রথীন ভাবে, অজয় যেন কতদিনের চেনা ওর । রথীন যেন ক্রমশঃ মালার প্রেমে পড়ে যাচ্ছে, আর দিনের পর দিন সেটা যেন দৃঢ় হচ্ছে । মালা যেন কত নিজের করে নিয়েছে রথীনকে । নীলার সঙ্গে থাকাকালীন রথীনকেই সব সিদ্ধান্ত নিতে হতো । এখন মালা-ই দোকানে যায় রথীনকে নিয়ে, রথীনের জামা কাপড় কেনার জন্যে । রথীনকে ওই ঠিক করে দেয় কোনটা মানাবে । রথীনেরও মনে হয় মালার পছন্দ ওর থেকেও ভালো । এমনকি রথীনের চুলের স্টাইলও এখন বদলে গেছে মালার ইচ্ছে মতন ।

রথীন, বহুদিনের নেশা সিগারেট খাওয়াও ছেড়ে দিয়েছে মালারই প্রচেষ্টায় । মদ্যপান করতো না রথীন আগে । তবে মালার পাল্লায় পরে সেটাও আরম্ভ করেছে ।

রথীন একেবারে বদলে গেছে, নিজেকেই মনে হয় আর একজন মানুষ । লোকেও বলে, 'তোকে তো আর চেনাই যায় না ।' রথীনের তাতে কিছু তো এসে যায় না, এমনকি ভালোই লাগে ।

রথীনের বন্ধুরা বলে 'তোর কি হয়েছে বলতো ? আমাদের সাথে তত আর মিশিস না । তোর চেহারা অন্যরকম হয়ে গেছে । ডায়েট করছিস? মনে কি প্রেমের ঢেউ এসেছে?'

রথীন যেন মালাকে এখন আরও বেশী করে ভালোবাসে । তাই একদিন বলেই ফেললো, 'মালা, এসো আমরা আবার দুজনে নতুন করে ঘর বাঁধি'।

উত্তরে মালার জবাব, 'এই একবছর ধরে তাই জন্যেই তো আমি আমার মতো করে তোমাকে গড়ে নিচ্ছি ।' কথার মর্ম রথীনের মাথার মধ্যে ঠিক করে না ঢুকলেও, রথীন বুঝে নিয়েছিল এতে মালার আপত্তি নেই । এমন কি মালা-ই কাছে টেনে নিয়েছিল রথীনকে চুম্বনে আপ্যায়িত করতে ।

বিয়ের দিনও ঠিক হয়ে গেল । কবে বিয়ে সেটাও মালা ঠিক করলো । কোথায় বিয়ে, কোথায় রিসেপশান এসব নিয়েই ব্যস্ত রইলো সে । সব কিছু ঠিক করেই, তবে জানাতো রথীনকে । যদিও রথীনের ইচ্ছে ছোটোখাটো একটা বিয়ে আর একটা ছোট্ট পার্টি । রথীন এতে আপত্তি করলো না কারণ নীলার সাথে থাকাকালীন রথীনকেই এসব হ্যাঙ্গামা পোয়াতে হতো । মালাকে কতো ওর পছন্দ সেটাই জানাবার জন্যে রথীন একদিন নিজে গিয়ে পছন্দ করে একটা রুবীর মালা কিনে আনলো এক নামকরা জুয়েলারের কাছ থেকে । এক বাগানে বসে মালার গান শোনার পর রথীন মালাকে গয়নাটা পরিয়ে দিয়ে বললো, 'মালা তুমি আমার এই শুণ্য জীবনে আনন্দের জোয়ার এনেছো । সেটাই জানানোর জন্যে আমার এই উপহার তোমার গলায় পরিয়ে দিলাম ।'

মালা খুবই খুশী হয়ে বললো, 'আমার কতো ভাগ্য! আমাকে অবাক করে দেবার জন্যেই তোমার এ উপহার বুঝি? গয়নার বাক্সটার ওপরেই লেখা আছে দোকানের নাম। ওখান থেকেই আমরা সব জুয়েলারী কিনতাম আগে । অজয় খুবই ভালোবাসতো মুক্তোর মালা । তুমি নিশ্চয় কিছু মনে করবে না, আমি যদি এই সেটটা ফেরত দিয়ে নতুন ডিজাইনের আর একটা মুক্তোর সেট কিনে নিয়ে আসি?'

এবার কেন, জানে না নিজেই রথীন, মনটা হঠাৎ ওর খারাপ হয়ে গেল । কিন্তু মুখে বললো, 'তোমার যা ভালো মনে হয়, তাই করো ।'

সেদিন বিকেলে বিদায় নেবার আগে মালা মনে করিয়ে দিল, 'তুমি কিন্তু কাল সকালেই আমার বাড়িতে আসবে । তোমাকে তোমার ধুতি শার্টটা দেখাবো যেটা বিয়েতে পরবে । কালকে একবার পরে দেখাবে আমায়, কেমন লাগে তোমাকে ওগুলো পরলে । আর তো আমাদের বিয়ের মাত্র চারটে দিন বাকী!'

রথীন যদিও বললো, 'তোমার পছন্দই, আমার পছন্দ', কিন্তু মালা বললো, 'একবার দেখে নিতেই হবে কেমন দেখাবে তোমাকে বিয়ের দিন ।'

পরের দিন — এই প্রথম রথীন মালার বাড়িতে । আগে আগে বহুদিন ওকে নাবাতে রথীন গেছে মালার বাড়িতে, কিন্ত কখনো বাড়ির ভেতরে ঢোকেনি । বাড়িটা ঝকঝকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । মালার বাড়িতে পৌঁছোবার পর চা জলখাবার এনে দিল মালা, নিজের হাতে রান্না করা খাবার । পাশে বসে খাওয়ালো । কতবার জিজ্ঞেস করলো, 'কেমন লাগলো ।'

রথীনের বউ নিজে রান্না করতো না । রান্না করার লোক ছিল তার । তাই রথীন মহা খুশী হয়েই বললো, তুমি খুব ভালো রান্না করো মালা ।'

মালা বললো, 'তুমি আজ আমার মনটা আনন্দে ভরিয়ে দিলে । অজয়ও আমার রান্নার খুব প্রশংসা করতো ।' এ কথা শুনে একটা অজ্ঞাত কারণে কেন যেন রথীনের মনটা ভারী হয়ে গেলো ।

রথীন বললো, 'আজ থাক, বিয়ের জামাকাপড়টা পরে দেখানো কালকে হবে, আজ চলি । এত খাওয়ার পরে শরীরটা আমার কেমন যেন করছে ।'

কিন্তু মালা শুনবে না । বললো 'আর তো দুটো দিন মাত্র বাকী আছে । এর মধ্যে তো আমার কতো কাজ । সবই তো আমিই করছি । তুমি শুধু বিয়ের পোশাকটা পরো আর আমাকে দেখাও, লক্ষীটি ।'

বাধ্য হয়েই রথীন সুন্দর দেখতে গরদের জামা আর ধুতি পরতে লাগলো । একটু পরে মালা ঘরে এসে বললো, 'আমি জানি তোমাকে কেমন লাগবে বিয়ের পোশাক পরে। এবার দেখাই আমার বিয়ের পোশাক বলে, খুললো একটা সুটকেস । সেখান থেকে বার করলো সুন্দর ভাবে পাটকরা ব্লাউজ, শাড়ী আর পেটিকোট, এমন কি একটা গয়নার বাক্স পর্যন্ত ।

রথীন বলে উঠলো, 'একি, তুমি নতুন জামা কাপড় কেনোনি বিয়ের জন্যে?'

মালা একটু মৃদু হেসে উত্তর দিলো, 'আমি ঠিক করেছি, আমার আগের বিয়ের সব কিছুই পরবো এ বিয়েতেও । তুমি এদিকে একটু এসো ।' বলে হাত ধরে মালা নিয়ে গেল আর একটা ঘরে ।

সেখানে একটা বিরাট খাট, বিরাট আয়না, বিরাট ড্রেসার । আয়নার সামনে রথীনকে দাঁড় করিয়ে ড্রেসার থেকে একটা গয়নার বাক্স বার করলো । সেখান থেকে একটা সোনার হার বার করে রথীনের গলায় পরিয়ে দিয়ে বললো, 'এটা আমি আমার অজয়কে উপহার হিসেবে পরিয়ে দিয়েছিলাম, এখন এটা তোমার । এটা পরেই অজয় আমাকে বিয়ে করতে এসেছিল । তোমাকেও এটা পরে আমাকে বিয়ে করতে হবে ।' বলেই, একটা ফটো নিয়ে এসে রথীনকে দেখিয়ে বললো, 'এটা আমার স্বামী অজয়ের ফটো । দেখো, ঠিক তোমার মতই দেখতে । তোমার মত লম্বা । তোমাকে কম করে খাইয়ে ওর মতই রোগা করিয়েছি । তোমার মতো চুল কাটা আর দেখো তোমার মতই বিয়ের সাজপোশাক । আমি বিয়ের সময় ভাববো আমি অজয়কেই বিয়ে করছি । কি মজা, তাই না!' বলেই মালা হা হা করে উন্মাদের মতো হেসে উঠলো ।

রথীন এক আশ্চর্য্য অজানা ভয়ে কেঁপে উঠলো । মাথাটা ঝিন্‌ঝিন্ করতে লাগলো। আর কোনো কথা না বলে, তাড়াতাড়ি করে দৌড়ে ছুটে বাড়ি থেকে বেরিয়ে, দরজা খুলে গাড়িতে ষ্টার্ট দিলো । শুনতে পাচ্ছিলো রথীন, মালা চিৎকার করে বলছে, 'অজয়, তুমি আমাকে আবার ফেলে চিরকালের মত চলে যেও না প্লিস, এবারে আর আমি বাঁচবো না।'

রিয়ার ভিউমিরারে রথীন দেখলো, মালা দুহাত সামনে ছড়িয়ে রথীনকে কাছে টানতে চাইছে অজয় ভেবে । রথীনের চোখ দুটো থেকে দুফোঁটা জল গালে এসে গড়িয়ে পড়লো, হয়তো তার মালাকে ভালোবাসার চিহ্ন হয়ে । কিন্তু এক ভয়ঙ্কর ভয় তাকে যেন শক্তি দিলো জোরে গ্যাসপেডেলে চাপ দিতে ।

শখের কবি

দীপঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

শখ জেগেছে কবি হবো
কেমন করে হই?
তোমরা যারা বন্ধু বান্ধব
বলতে পারো কেউ?
ঘেঁটেছি গল্প, পড়েছি কবিতা
লিখেছি কত কি
রস ছন্দ হারিয়ে গুলিয়ে
হয়ে যায় সব আজগুবি ।
ছিঁড়েছি কাগজ ঘসেছি কলম
করেছি নানান চিন্তা ।
ধুতি পাঞ্জাবী পরে, কবি সেজে
চোখে দিয়ে দামী চশমা ।
বলবো কি ভাই দুঃখের কথা
করলাম কত কি
কিছুই আমার মাথায় এলো না
হয়রানি হচ্ছি খালি ।
চলতে ফিরতে ভাবনা করি, ঘুমের ঘোরে বকবক করি
তাতে গৃহিণী যায় ক্ষেপে ।
মুগুর হাতে তেড়ে আসে, মাথায় ভূত চেপেছে ভেবে ।
আরতো পারিনা করতে কিছু
হতাশা আসছে মনে
লক্ষী ভাইটি এসো না একটু
আমায় তুলে ধরতে ।

যোগসূত্র

ধীমান চক্রবর্তী

তোমার সাথে ভোরবেলা কলকাতা,
তোমার সাথে আউটরামের ঘাট,
তোমার সাথে হাওয়ায় খেজুরপাতা,
তোমার সাথে ভুবনডাঙার মাঠ ।

তোমার সাথে কলেজ স্ট্রীটে টহল,
তোমার সাথে নাটক — অ্যাকাডেমি,
তোমার সাথে হঠাৎ শীস্‌মহল,
তোমার সাথে কিঞ্চিৎ আল্‌সেমি ।

তোমার সাথে ইডেন — ক্রিকেট খেলা,
তোমার সাথে মেঘলা ছুটির দুপুর,
তোমার সাথে সন্ধ্যায় বইমেলা,
তোমার সাথে বৃষ্টি টাপুর টুপুর ।

তোমার সাথে বিকালবেলায় ছাত,
তোমার সাথে মাছভাজা আর চা,
তোমার সাথে দীর্ঘ শীতের রাত,
তোমার সাথে কথা ফুরায় না ।

তোমার সাথে বিচার বিপরীত,
তোমার সাথে তর্ক হরেক রকম,
তোমার সাথে রবীন্দ্রসঙ্গীত,
তোমার সাথে পায়রা বকম বকম ।

তোমার সাথে যা কিছু সম্বল,
তোমার সাথে ভাগ ক'রে খাওয়া রুটি,
তোমার সাথে মেঘ না চাইতে জল,
তোমার সাথে প্রত্যহ খুনসুটি ।

তোমার সাথে মোমবাতিটির আলো,
তোমার সাথে অন্তরে হাতছানি,
তোমার সাথে মজলিস্ জমকালো,
তোমার সাথে বিখ্যাত রাজধানী ।

তোমার সাথে দিনের অভিযান,
তোমার সাথে অফিস থেকে বাড়ি,
তোমার সাথে কাব্যে পরিত্রাণ,
তোমার সাথে বেগ্‌নে রঙের শাড়ি ।

তোমার সাথে বনবাদাড়ে ঘোরা,
তোমার সাথে ছুটি ছোট ছোট,
তোমার সাথে নানান্ লেখা পড়া,
তোমার সাথে স্বপ্নরাজ্যে টো টো ।

তোমার সাথে হলুদ, সবুজ, নীল,
তোমার সাথে বিচিত্র সব ছবি,
তোমার সাথে রোদ্দুরে গাঙচিল,
তোমার সাথে এম্‌নি শখের কবি ।

তোমার সাথে মাঝদরিয়ায় একা,
তোমার সাথে রাঙা মাটির পথ,
তোমার সাথে পিছন ফিরে দেখা,
তোমার সাথে সিদ্ধ মনোরথ ।

তোমার সাথে একান্তে পাগলামি,
তোমার সাথে শালুকফুলে ঢেউ,
তোমার সাথে থাকব শুধু আমি,
আমার সাথে থাকবে না আর কেউ ।

আমার মধুবালা

এম. এম. খায়রুল আনাম

১৯৬০ সালের ৫ই আগষ্ট অরিজিনাল ''মুঘল-এ আজম'' রিলিজের ৪৪ বছর পর, ২০০৪ সালে ডিজিটালী বানানো রঙীন কপিটা খুব অভিনিবেশ সহকারে মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম। দেখি, হঠাৎ মধুবালা টেলিভিশন থেকে বেরিয়ে, ধীরে ধীরে পা ফেলে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি ত হতবাক। শেষ পর্য্যন্ত মধুবালা তাহলে আমার ডাকে সত্যিই সাড়া দিল, মনের মধ্যে বাঁধভাঙা খুশীর জোয়ার বয়ে যাচ্ছে, কিন্তু বাইরে বেশ গম্ভীর ভাব করে থাকলাম। মধুবালা আস্তে আস্তে আমার পাশে বসল। ফিস্ ফিস্ করে বলল,

''বাবুর কি খুব মন খারাপ?''

আমি রাগের ভান করে চুপ মেরে থাকলাম। ও আমার পিঠে হাত দিয়ে আবার বলল,

''বাবুর কি সত্যিই মন বহুত খারাপ?''

ঘুরে বসে বললাম, ''মন খারাপ হবে না? এতদিনে তোমার সময় হলো। দেরী করতে করতে তোমার সব আশাই ছেড়ে দিয়েছি।''

''কি করব বল। কতরকম ঝামেলার মধ্যে দিয়ে আমার জীবনটা কেটেছে তাতো তুমি জান। এখন না হয় একটু সময় পেয়েছি। তাছাড়া তুমি ত তখন অনেক ছোট ছিলে। তোমার চেয়ে ঢের বড় একটা সিনেমার মেয়ে পাশে ঘুর ঘুর করছে দেখলে লোকে কি বলত? শরমিন্দা কি বাত হোয়ে যেত না?''

''বড় মানে কি, অ্যাঁ? নায়িকাদের আবার কোন বয়স থাকে নাকি? তাও তোমার মতো অনন্তযৌবনার? আসল কথায় এস। কোথায় দিলীপকুমার, কিশোরকুমারদের গ্যাং, আর কোথায় পুঁচকে আমি।''

''অত অভিমান করে না। মাগার, তোমার কথাগুলো উড়িয়ে ভি দেওয়া যায় না। ঠিকই ত, নায়িকাদের বয়স বাড়তে নেই। জান, একটা জিনিস আমি লক্ষ্য করেছি, তোমাদের বাংলাভাষায় আমার নামের আগে সদাই লাস্যময়ী কথাটা জুড়ে দিত। মানেটা ঠিক যে কি তা সমঝ মে আসতো না। কিন্তু শব্দটা আমার খুব ভাল লাগত।

আর দিলীপকুমারের কথা বলছ? হাঁ, ইয়ে বাত সাচ হ্যায়। ও মেরা দিলকা আদমী থা। তোমার কাছে অস্বীকার করব না, আমি ওকে পাগলের মত ভালবাসতাম। আমার মনের একটা কোণ ও জুড়ে বসে আছে, হামেশা কে লিয়ে। চিরকাল থাকবে।''

''বুঝলাম না, সেটাই যদি সত্যি হয় তাহলে কিশোর কুমার?''

''বাদ দাও ত কিশোরের কথা। বিলকুল ছোড় দো। একটা কাপুরুষ।''

''তুমি দেখি দেদার চটে যাচ্ছ। আচ্ছা কিশোরের কথা না হয় এখন থাক। তা কি হয়েছিল দিলীপকুমারের সঙ্গে, ব্যাটে বলে হলো না কেন?''

''আর বলো না। রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয় উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।''

''বলছ কি? তুমি উলুখাগড়া ? অতবড়ো একজন প্রতিভাবান সুন্দরী, ভারতের মেরিলীন মনরো, মোস্ট পপুলার ভিনটেজ হিন্দী অ্যাকট্রেস অফ অল টাইমস, সেকেন্ড ইন টপ টেন বলিউড'স হিন্দি অ্যাক্ট্রেসেস এভার — তুমি উলুখাগড়া ?''

''আরে বাবা, ছোড় না ইয়ে সব বাকোয়াছ। বলিউডের পুরুষ সমাজে মেয়েদের যে কতটা মর্য্যাদা সেটা তুমি বুঝবে না, আমরা মেয়েরা হাড়ে হাড়ে টের পাই।''

''খুলে বল। আচ্ছা, তার আগে এটা শেষ চেষ্টা — ডাইনে দিকপাল দিলীপকুমার, বাঁয়ে দিকপাল কিশোরকুমার, এর মধ্যে আমি কোথায় পড়ি?''

''তুম বাঙালী বাবু হো না ? বুদ্ধিটা ঘড়ি পকেটে থাকবেই। শোন লাড়কা, তুমি ছোটবেলা থেকে আজও মুগ্ধ হোয়ে আমাকে অত করে চেয়ে চলেছ, শুধু এক নজর দেখা, একটু সান্নিধ্য পাওয়ার জন্য। তোমার মত ওরা কখনও আমাকে সেভাবে চায়নি। মোহ, কাম আর খ্যাতির জোরে সবার স্বপ্নের আকাঙ্খিত একটা মেয়েকে বাগাতে পারার গৌরব — এই ছিল ওদের চাহিদার মূল কথা। ওদের সঙ্গে তুলনায় মোত্ যাও।''

''আচ্ছা, এখন খুলে বল, কি হয়েছিল দিলীপকুমারের সঙ্গে, যার জন্য তোমার সারা জীবনের সুখের আশায় অমন করে ছাই পড়ল?''

''সে বহুত লম্বি কাহানি। পার্সোনালিটি, সমাজ ব্যবস্থা, আমার নসিব — ঠিক যে কোনটা কি করে বলি? হয়ত সব মিলিয়েই একটা। দিলীপের সঙ্গে আমার পহেলী মুলাকাত হয় ১৯৪৪ সালে, ''জোয়ার ভাঁটা'' ছবির সেটে। পর্দায় রোমান্টিক জুটি হিসেবে আমরা একসঙ্গে চারটে ছবি করেছি।'' ১৯৫১ সালে যখন ''তারানা'' ছবিটা করতে গেলাম, তখন থেকে আমাদের পর্দার বাইরের সম্পর্কটাও রোমান্টিকে মোড় নেয়। আমি কিন্তু যাকে বলে খুব ''লো প্রোফাইল'' মেন্টেন করতাম। পাবলিক অ্যাপিয়ারেন্স, ইন্টারভিউ, এগুলো এড়িয়ে চলতাম। লোকেরা যা খুশী আন্দাজ করে আমার রোমান্স নিয়ে লিখত, বিশেষ করে দিলীপকে জড়িয়ে। বার দু'য়েক এর ব্যতিক্রম হয়েছে। একটা ছিল ১৯৫৪ সনে ''বহুত দিন হুয়ে''-র প্রিমিয়ার শোতে, অন্যটা হলো ''ইনসানিয়েত'' এর প্রিমিয়ারে, যখন দিলীপকুমার আমাকে এসকর্ট করে নিয়ে যাচ্ছিল। মজার ব্যাপার কি জান? ''ইনসানিয়েত'' ছবিটার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই ছিল না। অথচ দিলীপকুমার নিজে আমাকে পাবলিকলী এসকর্ট করছে। তো ইয়ে প্রুভ হো গ্যায়া কে, দিলীপের সঙ্গে জরুর আমার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে। আসলে দুটো ছবিরই প্রডিউসার / ডিরেক্টার ছিল এস. এস. ভাসান। আমি ওনাদের কাছে কৃতজ্ঞ। ''বহুত দিন হুয়ে'' করার সময় আমি যব অসুস্থ হয়ে পড়ি, উস ওয়াক্ত ভাসানজিরা আমাকে বহুত টেক কেয়ার করেছিল। আসলে দিলীপের প্রতি প্রেম ও ভাসানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা, দুটোই সত্য ছিল। এবং এটাও ঠিক যে, ১৯৫১ থেকে ১৯৫৬ — এই পাঁচ বছর দিলীপ ও আমি চুটিয়ে প্রেম করেছি।

''তাহলে কাবাবের মধ্যে হাড্ডি এসে গেল কেমন করে?''

''আরে সে এক বিশ্রী নোংরা ব্যাপার। ১৯৫৭ সালে ডিরেক্টার বি. আর. চোপরা আমাকে আর দিলীপকে নিয়ে ''নয়া দৌর'' ছবির আউটডোর শুটিং করার জন্য প্ল্যান করেন। মুস্কিলটা ছিলো আউটডোরটা দীর্ঘদিনের এবং তার জন্য ভূপালে যেতে হবে। এতে আমার আব্বা আতাউল্লা খান আমার যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি করেন। ওনার অভিযোগ হলো, চোপরা সাহেব আমার সঙ্গে দিলীপের নিভৃতে গুড টাইম দেবার জন্য ইচ্ছা করেই এই প্ল্যানটা করেছে।

চোপরা সাহেব সে কথায় কান না দিয়ে উলটে আমাদের নামে স্যু, মানে মামলা দায়ের করেন। ওনার কথা, আমি নাকি ছবি করার জন্য অ্যাডভান্স নিয়েছি অথচ ছবিটা শেষ করতে চাইছি না। তাই প্রতিশ্রুতির বরখেলাপ করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, উনি ইতিমধ্যে আমার জায়গায় দক্ষিণ ভারতীয় শিল্পী বৈজয়ন্তীমালাকে নিয়ে কাজও শুরু করে দিয়েছেন। এটা এবং বাবার মেয়ে — এই দুই পয়েন্ট ধরে আমি বাবার পক্ষ নিই। উপায়ান্তর না দেখে চোপরাজী তখন দিলীপকুমারের শরণাপন্ন হোয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য অনুরোধ করেন। দিলীপ ওপেন কোর্টে গিয়ে আমার আর আব্বার বিরুদ্ধে চুক্তিভঙ্গের সাক্ষী দেন। এতে আমার পার্সোনাল ও প্রফেশনাল লাইফ নিদারুণ ও অপুরণীয় ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এতে এটাই প্রমাণ হল যে আমি একজন নির্ভরশীল শিল্পী নই। বাজারে আমার সুপ্রতিষ্ঠিত বিশাল গুডউইল একেবারে চুরমার হয়ে গেল। বাকী জীবনটা আমাকে খুব স্ট্রাগল করতে হয়েছে সেই গুডউইলটা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে সেই থেকে প্রকৃতপক্ষে দিলীপের সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।''

''ইদানিং মধুর ভুষণ, মানে তোমার বোন, ইন্ডিয়ান ওয়েব পোর্টাল ''রেডিফ'' এ যে ইন্টারভিউটা দিয়েছে, তার ভার্সান কিন্তু অন্যরকম।''

''মানে? কি বলতে চাচ্ছো তুমি?''

''উনি বলেছেন, দিলীপের সঙ্গে তোমার ছাড়াছাড়ির জন্যে বি. আর. চোপরার ছবি ''নয়া দৌর'' ই দায়ী, তোমার বাবা নন। তুমি ছবির কিছুটা অংশ করার পর চোপরা সাহেব সিদ্ধান্ত নেন যে, গোয়ালিয়রে গিয়ে আউটডোর শুটিং করা হবে। সেখানে তখন ভীষণ ডাকাতদের উপদ্রব ছিল। মেয়ের নিরাপত্তার জন্য ভয় পেয়ে, বাবা অনুরোধ করেছিলেন লোকেশনটা বদল করতে। ওনারা সেকথায় কান দেননি। ওনাদের কথা হলো গোয়ালিয়রের মতো একটা পাহাড়ী এলাকা ছবির জন্য দরকারি। তখন বাবা মধুবালাকে বললেন, তার রোলটা ছেড়ে দিতে। তিনি ক্ষতিপুরণের টাকাও দিতে রাজী ছিলেন। সেকথা না শুনে চোপরা সাহেব তখন দিলীপ কুমারের সাহায্য চান। ইতিমধ্যে মধুবালা আর দিলীপকুমারের এনগেজমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। দিলীপকুমার মধ্যস্থতা করার অনেক চেষ্টা করেন। কিন্তু মধুবালা বাবার অবাধ্য হতে অস্বীকার করেন। এতেও তাদের সম্পর্কে চিড় খায়নি। দিলীপ তখন বললেন, ''ছেড়ে দাও ত তোমার মুভীলাইন, চল আমরা বিয়ে করে ফেলি।'' মধুবালা বললেন, ''ঠিক আছে আমি তোমার কথা মেনে নিতে রাজি আছি। কিন্তু একটা সর্তে, তুমি আব্বার কাছে ক্ষমা চাইবে।'' দিলীপ সা'ব ক্ষমা চাইতে অস্বীকার করেন। তাই মধুবালাও দিলীপকে ত্যাগ করেন। ঐ একটা ওয়ার্ড — ''সরি'', বলা হলে মধুবালার জীবনটা আজ সবাইকে অন্যরকমভাবে পড়তে হতো। .... মরার আগের মূহুর্ত পর্য্যন্ত মধুবালা দিলীপ সা'ব কে ভালবেসে গিয়েছিলেন। তার অন্তিম ইচ্ছা ছিল, মৃত্যুর পর যেন অন্ততঃ একবার দিলীপ সা'ব তার কবরে এসে তার জন্য দোওয়া করেন। তা দিলীপ সা'ব সত্যিই একদিন এসে তার কবরে ফাতেহা পাঠ করেছিলেন।''

''উহ পাগলী ইতনা তক বোল দিয়া? চলো ঠিক হ্যায়। দুনিয়ার যত কন্ট্রাডিকশান খোলাসা করে সে একটা কাজের কাজ করেছে।

''এখন কিশোর কুমার এপিসোডটা কি একটু বলা যায়?''

''ওর কথা আর ব'লো না। একটা কাপুরুষ, বদমেজাজী আর ধড়িবাজ। প্রতিভাময়ী সুন্দরী দেখলে আর উপায় নেই। দেখলে না, চার, চারটে বিয়ে করে বসে আছে। কিশোরের সঙ্গে আমার দু'বার মোলাকাত হয়েছিল — প্রথম ১৯৫৮ সালে, — ''চলতি কা নাম গাড়ী'' ও ১৯৬১ সালে ''ঝুমরু'' করতে গিয়ে। তখন তার বাঙালী বহু ছিল, নাম রুমা গুহঠাকুরতা, যার সঙ্গে পরে তার ডিভোর্স হয়ে যায়। আমার নাজুক শরীর ও মামলায় হারার মানসিক বিপর্যয়ের সেই সব দুর্দিনে ও কাছে ঘেঁষতে থাকে। ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে আমাকে সঙ্গ ও সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে সেই দুর্বিসহ নিঃসঙ্গ গুমোট জীবনে আমার প্রাণে কিছুটা ঠান্ডা বাতাস বইয়ে দেয়। আস্তে আস্তে আমি ওর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ি। ও একসময় আমাকে বিয়ের প্রস্তাব করে। সমুদ্রে খড়কুটো পাওয়ার মত আমি ওর মধ্যে আশ্রয় খুঁজে পাওয়ার আশায় বিয়েতে রাজী হোয়ে যাই। একটা বড় প্রতিবন্ধক ছিল। আমি গোঁড়া মুসলিম পরিবারের মেয়ে আর কিশোর গোঁড়া হিন্দু ঘরের ছেলে। কিশোর বলল, ''কোয়ী বাত নেহি, আমি মুসলমান হোয়ে যাব।'' আব্দুল করিম নাম নিয়ে ও সত্যিই মুসলমান হয়ে গেল। সেইভাবে প্রাইভেট সেরিমনিতে আমাদের শাদী হোয়ে যায়। কিন্তু দু'পক্ষকে সামাল দেবার জন্য প্রকাশ্যভাবে, ১৯৬০ সালে আমাদের আবার সিভিল ম্যারেজ হয়। মাগার কিশোরের অটল বাবা মা সেই বিয়েতেও আসেন নি। তখন ওর বাবা মাকে খুশী করার জন্য আবার আমাদের হিন্দুমতে বিয়ে হয়। কিন্তু এত করেও ওনারা আমাকে কিশোরের জরু হিসেবে কভী অ্যাকসেপ্ট নেহি কিয়া। সংসারের মধ্যে এতনা টেনশন, অপমান, অপদস্থতা থেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচার জন্য মাত্র একমাসের মধ্যেই আমাকে আমার বান্দ্রার বাংলোতে ওয়াপেস আসতে হয়। এর পরেও বাকী জীবনটা আমি কিশোরের স্ত্রী হিসেবেই বেঁচে ছিলাম। সবচেয়ে দুঃখটা কি জান? ও এমনই মেরুদন্ডহীন ছিল যে, ভয়ে আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখত না। আমার মরার মাসখানেক আগে থেকে আমার শরীরের দ্রুত পতন শুরু হয়। তখন সেই প্রায় অজ্ঞান অবস্থায় ওর বুকে একটু মাথা রাখার জন্য আমি দু'হাত বাড়িয়ে থাকতাম। শয্যার পাশে থেকে আমার বোন সেকথা জানিয়ে ওকে বহুবার টেলিফোন করেছে। ডরপুকটা কিছুতেই আসত না, অনেকবার ফোন রেখে পর্যন্ত দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত একদিন হুট করে এসে মাত্র পনের মিনিটের মধ্যেই চলে যায়। এর পাঁচদিন পর আমি মারা যাই। স্যরি, কিশোর সত্যিই অত খারাপ ছিল না। আমি রাগে, দুঃখে অনেক কুকথা বলে ফেলেছি। হাজব্যান্ডের নিন্দা করা হারাম। নিন্দা করলে গুনাহ হয়, দোজখে যেতে হয়।''

''আমিও স্যরি, ব্যাপারটা সত্যিই খুব ট্র্যাজিক, গভীর অনেক দুঃখের। আচ্ছা কি সব অসুস্থতার কথা বলছিলে না? কি অসুখ হয়েছিল তোমার?''

''আরে বাপরে! অসুখ হয়েছিল না, অসুখটা ছিল। জন্মসূত্রেই এসেছিল আমার নিত্যসঙ্গী হোয়ে। ওটার একটা গালভরা নাম আছে ইংরেজীতে, যাকে বলে, ভেনট্রিকুলার সেপ্টাল ডিফেক্ট, সহজ কথায় হার্টের মধ্যে ফুটো। ১৯৫০ সালে একবার রক্তবমি করলে তা ধরা পড়ে। তখন সেটা ধামাচাপা দিলেও, ১৯৫৪ সালে মাদ্রাজে ''বহুত দিন হুয়ে'-র সেটেই আবার রক্তবমি হয়। ওই সময় ডিরেক্টর এস. এস. ভাসান ও তাঁর স্ত্রী মিলে আমাকে অনেক যত্ন করার কথা আগেই বলেছি। অবশ্য আমার ফ্যামিলি আমাকে সবদিক দিয়ে সর্বতোভাবে প্রোটেক্ট করেছে। সে দিক থেকে আমি অনেক ভাগ্যবতী। সারাজীবন তারা আমার জন্য বিশেষ ভাবে ঘরকা পাকানা খানা ও বিশেষ কুঁয়া থেকে পানি বয়ে নিয়ে আসত, যাতে আমি ইনফেকশন থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে পারি। ১৯৬০ সালে আমার অবস্থার আরো অবনতি হলে, চিকিৎসার জন্য আমাকে লন্ডন নিয়ে যাওয়া হয়। জটিল হার্টসার্জারির তখন শিশুকাল। সে যুগে, এখনকার মতো হার্ট এর চিকিৎসা সম্বন্ধে স্বয়ং ডাক্তাররাই ভালভাবে কিছু জানত না, বুঝত না। যাই হোক, ডাক্তাররা কাফি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে বললেন, এত এডভান্স স্টেজে সার্জারী করলে ওর শরীর নিতে পারবে না। আপনারা বরং ওকে বাড়ী নিয়ে যান। শরীরের ওপর ধকল পড়ে — এরকম কাজ কাম না করলে সে বছর খানেক টিকতে পারে। তো ডাক্তারদের মুখে ছাই দিয়ে আমি আরো নয় বছর বেঁচে ছিলাম। আমার ৩৬ তম জন্মদিনের কিছুদিন পরে, ১৯৬৯ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী, তোমাদের জগত ছেড়ে আমি চলে যাই। সান্তাক্রুজ কবরস্থানে কবর দেবার সময় অবশ্য কিশোরকুমার এসেছিল। এটাই আমার শেষ সান্ত্বনা।''

''এই শরীর নিয়ে হাড়ভাঙা পরিশ্রম, অনিয়মিত শেড়ুল, উত্থান পতনের অনিশ্চিত কেরিয়ার তুমি বেছে নিলে?''

''তার কারণ দুটো। দ্বিতীয়টা আগে বলি। সেটা হলো অভাব, যেটা আমাদের ফেমিলির জন্য একটা অত্যন্ত অপমানকর, মর্মান্তিক পজিশন। তুমি কেন, অনেকেই বোধ হয় জানে না, আমাদের পূর্বপুরুষ ছিল আফগানিস্থানের মোহাম্মদজাই রাজবংশ থেকে উদ্ভুত, কাবুলের নবাব পরিবার। রাজনৈতিক কারণে আফগান আর্মি আমার দাদা-দাদীকে ইন্ডিয়াতে নির্বাসন দেয়। প্রথম এসে তারা দিল্লীতে সেটল করে। সেখানে আমার জন্ম হয় ১৯৩৩ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। নাম দেওয়া হয় মমতাজ জাহান বেগম দেহলবী। এগার জনের মধ্যে আমি ছিলাম পঞ্চম সন্তান। পরে ভাই বোন মিলে ৬ জন মারা গিয়েছিল। বাবা আতাউল্লা খানের পেশোয়ারের ইম্পিরিয়াল টোব্যাকো কোম্পানির চাকরীটা যখন চলে গেল, বাবা আমাদেরকে নিয়ে তখন আজকের মুম্বাইএ রিসেটেল করলেন। ওখানে দিনের পর দিন ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে ঘুরে ঘুরে শেষ পর্য্যন্ত ঢোকার একটা চান্স পেলাম। তখন আমার বয়স মাত্র ন' বছর। না ঢুকে কোন উপায় ছিল না, সবাইকে একরকম না খেয়ে মরতে হতো। ..... এখন প্রথম কারণটা বলি। বাইরে থেকে দেখতে নরম সরম হলেও ভিতরে ভিতরে কিন্তু আমি অসীম ধৈর্য্যশীল ও অসম্ভব জেদি। তবে কোন খারাপ অর্থে নয়। আমার জিদ চাপল, বিধি আমার শরীরে কিছু অক্ষমতা দিলেও আমি তার কাছে কখনই হার মানবো না। দেখিয়ে দেব যে, আমি কারো চেয়ে কোন অংশে কম নই। তুমি ত নিজেই বললে, কাজের গুণে সমসাময়িক নার্গিস, মিনাকুমারী ও অন্যান্যরা, এমন কি আজকে নতুন প্রজন্মের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীদের মিলিয়েও হিন্দী চিত্র জগতের সর্বকালের সবচেয়ে প্রতিভাবান ও সুন্দরী অভিনেত্রীদের একজন বলে আজও সবাই আমাকে মান্যগণ্য করে চলেছে।''

''তোমার পারিবারিক জীবনের অনেক কথাই ত বললে, থ্যাঙ্ক ইউ। ফিল্মীজীবনের কথা একটু শুনি। মমতাজ জাহান মধুবালা হলো কি করে?''

''১৯৪২ সালে ''বসন্ত'' ছবিতে তখনকার জনপ্রিয় নায়িকা মমতাজ শান্তির কন্যা হিসেবে অভিনয়ে আমার প্রথম হাতেখড়ি হয়। এর পর বেশ কয়েকটা ছবিতে আমি চাইল্ড আর্টিস্ট হিসেবে অভিনয় করি। তখনকার মুম্বাই চিত্রজগতের সবচেয়ে বিখ্যাত ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব দেবীকা রাণী, আমার পারদর্শিতায় মুগ্ধ হোন ও আমার মধ্যে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সম্ভবনা দেখতে পান। উনিই আমাকে ''মধুবালা'' নামটা নিতে উপদেশ দেন। মানেটা হলো, মধু দিয়ে তৈরী একটি মেয়ে। একটু বয়স হতে আমার প্রস্ফুটিত যৌবনের রূপ দেখে সবাই পাগল হয়ে গেল। আমার আত্মবিশ্বাসও সেই সঙ্গে দৃঢ় হচ্ছিল। মাত্র ষোল বছর বয়সে ''মহল'' ছবিতে আমার রূপ ও অভিনয় দেখে, আমার সহঅভিনেতা, ভেটেরান অশোককুমারকে ছেড়ে, সবাই আমাকে নিয়ে হৈ চৈ শুরু করে দিল। এই ছবির হিট

গান, ''আয়গা আনেওয়ালা'' দু'জন সম্ভাবনাময় সুপারস্টারের ইঙ্গিত বয়ে আনল — আমি মধুবালা আর প্লেব্যাক সিঙ্গার লতা মুঙ্গেশকর। তোমরা অনেকেই হয়তো জান না, আমেরিকার পত্রিকাগুলোর সিনেমা পাতায় ও ''থিয়েটার আর্টস'' এর মতো পত্রিকাগুলোয়, আমাকে নিয়ে অনেক লেখালেখি হয়েছে। এক পত্রিকায় একটা ফুল পেজ ফটো দিয়ে লেখা হয়েছিল, ''দি বিগেস্ট স্টার ইন দি ওয়ান্ড'' (এন্ড শি ইজ নট ইন বেভারলি হিলস)''। আমেরিকান ফিল্মমেকার ফ্রাঙ্ক ক্যাপরা স্বয়ং বম্বে এসেছিলেন আমাকে তাঁর ফিল্ম এর জন্য সই করাতে। আমার কনজারভেটিভ বাবা রাজী হননি বলে ভারতীয় মধুবালার হলিউডি অভিনেত্রী হবার সুযোগের ওখানেই ইতি ঘটে।

আমার ওই সংক্ষিপ্ত জীবনকালে, আমি ৭০ টার বেশী ছবিতে অভিনয় করেছি, তখনকার সব জনপ্রিয় ও লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেতাদের বিপরীতে ও সবচেয়ে নামকরা অভিনেত্রীদের পাশাপাশি যেমন, অশোককুমার, রাজকাপুর, রেহমান, প্রদীপকুমার, শাম্মীকাপুর, দিলীপকুমার, সুনীল দত্ত, ভারতভূষণ, গুরুদত্ত, দেবানন্দ ইত্যাদি। অভিনেত্রীদের মধ্যে কামিনীকৌশল, সুরাইয়া, গীতাবলী, নলিনীজয়ন্ত, নিম্মী-রা ছিলেন। সবচেয়ে প্রতিভাবান ডিরেক্টরদের মধ্যে পেয়েছিলাম, মেহবুব খান (অমর), গুরু দত্ত (মিঃ এন্ড মিসেস ৫৫), কামাল আমরোহী (মহল), কে আসিফ (মুঘল এ আজম)। ১৯৬০ সালের ৫ই আগষ্ট মুঘল এ আজম রিলিজ হবার পর বক্স অফিস এমন ভাবে হিট হয় যে পরবর্তী ১৫ বছর তার ধারে কাছে কেউ ঘেঁষতে পারেনি। ১৯৭৫ সালে ''শোলে'' রিলিজ হবার পর সেই রেকর্ড ভাঙে। এই মুঘল-এ আজমের আনারকলি চরিত্রেই আমাকে একেবারে শেষ করে দিয়েছে আবার বাঁচিয়েও রেখেছে। জানি তুমি বলবে কথাটা কনফিউজিং। শোন, খুলে বলছি। ডিরেক্টর কে, আসিফ সাহেব ধারণাও করতে পারেন নি যে আমি কতখানি অসুস্থ। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৯ — দীর্ঘ এই আটবছর ধরে কঠোর শাস্তিমুলক, একনাগাড়ে ঘন্টার পর ঘন্টা শুটিং এর শেডুল আমার শরীরটাকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল। গরমের মধ্যে, তীব্র লাইটের নীচে ঘোমটাওয়ালা মুর্তি হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকা, ভারী শিকল পরে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা অবস্থায় একটা পর একটা শট নেওয়ার ধকল। সবচেয়ে অসহায় ও দুঃসহ অবস্থা ছিলো দিলীপকুমারের সঙ্গে অভিনয় করাটা। অত তিক্ততা ও ছাড়াছাড়ির পর, কাফি টেনশন ও অপমান চেপে রেখে আবার তার সঙ্গে দারুণ সব রোমান্টিক সিন করা ও তার জন্য শেষমেশ মরে যাওয়া। সেই ধকলেই আমার দ্রুত স্বাস্থ্যভঙ্গের প্রকৃত কারণ হয়ে দাঁড়ায় আর তা আমার মৃত্যুর দিনকে ত্বরান্বিত করে।

এখন মন দিয়ে শোন, কয়েকটা মজার কথা বলি। গুরু দত্ত তার ''পিয়াসা'' ছবি করার সময় প্রথমে আমাকে আর নার্গিসকে ঠিক করেছিল। কিন্তু সে জায়গায় মালা সিনহা ও ওয়াহিদা রহমানকে নেওয়া হয় এবং দু'জনেই সেখান থেকে স্টার বনে যায়। আমার সিনেমার স্মরণীয় গানগুলোর ডাবিং করেছে লতা মুঙ্গেশকর ও আশা ভোঁসলে। দোনো কে লিয়ে ম্যায় এক লাকি হিরোইন নিকলী। ১৯৪৯ সালে ''মহল'' ছবিতে আমার মুখে লতার গানটা দারুণ হিট করে। এর ৯ বছর পর, ১৯৫৮ সালে চারটে ছবিতে আমার মুখে আশার গান, আশাকে বিখ্যাত ও নিজের বোনের এক প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ''চঞ্চল'' নামে আমার এক বোন প্রায় আমার মত দেখতে ছিল। আমার সঙ্গে ''ঝুমরু'' ও অন্যান্য ছবি করেছে। আলাদা ভাবেও করেছে, যাদের মধ্যে মেহবুব খান এর ''মাদার ইন্ডিয়া'' ও রাজকাপুরের ''জিস দেশমে গঙ্গা বেহতি হ্যায়'' এর নাম করা যায়। আমার বিরাট ভুল হয়েছে বিমল রায়ের ''বিরাজ বৌ'' এর অফারটা ওভাবে ছেড়ে দেওয়াটা। ওরকম আরো বহুত কাহানি আছে। বাদ মে বোলেগা এক এক করকে। আজকে এখন চলি, শাব্বা খায়ের — বলে লাফ দিয়ে উঠে পড়ে মধুবালা ফিরে আবার গিয়ে টেলিভিশন এর মধ্যে ঢুকে পড়ল।

''মধুবালা, মমতাজ, মমতাজ জাহান, মমতাজ জাহান বেগম, একটু দাঁড়াও, এত তাড়াতাড়ি ওভাবে চলে যেওনা প্লীজ .....।''

''হলো কি তোমার? সারারাতটা এই সোফায় শুয়ে কাটিয়ে দিলে! ..... কতবার এসে ডেকে গিয়েছি। এই আসছি, আসছি ব'লে শেষ পর্য্যন্ত আর উঠতেই পারলে না। এখন এত বেলা করে ঘুমের মধ্যে বাচ্চাদের মতো গাঁও গাঁও শব্দ করছ আর উপরের দিকে হাত বাড়াচ্ছ। নাও ধর, উঠে চা খাও তো। যত্তো সব ...'' ব'লে বউ ঠক করে চায়ের কাপটা রেখে দিয়ে ভেতরের ঘরে চলে গেল।

মা

দেবীপ্রিয়া রায়

মেটানাইরা-

কিছু যেন একটা ঘটছে বা ঘটতে চলেছে — অস্বস্তিতে ঘুমটা ছেঁড়া ছেঁড়া। কিন্তু প্রানপণ করেও সেই কিছুটাকে ধরা ছোঁয়া যাচ্ছেনা। ছটফট করতে করতে হঠাৎ ঘুমটা ভেঙেই গেল — কিন্তু চোখ মেলে তাকাতে ঘর ভরা অন্ধকার ছাড়া আর কিছু নজরে এলো না। অবশ্য দেয়াল জুড়ে ঝোলানো ভারী মখমলের পর্দার জন্য বাইরের আলো এখানে ঢুকতে পারেনা, তবু মনে হয় দিনের দেবতা হিলিয়সের সোনার রথে চড়ে পরিক্রমায় বেরুতে এখনো দেরী আছে অনেক। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন সেলেউস গভীর ঘুমে মগ্ন।

বড় ক্লান্ত থাকেন সেলেউস আজকাল, চিন্তিতও বটে — ভূমধ্যসাগরের আশেপাশে খরা চলেছে আজ বহুদিন। জলাভাবে গত মরসুমে মাঠে গম, যবের শীষ শুকিয়ে খড় হয়ে গিয়েছে, মাঠ জুড়ে বন্ধ্যা অলিভের গাছ দাঁড়িয়ে আছে। শস্য নেই, ফল নেই — হাহাকার পড়ে গেছে চারধারে। না খেয়ে মরছে মানুষজন। তাঁদের এই ছোট্ট জনপদ এলেউসিস ও ব্যতিক্রম নয়। পথেপথে ক্ষুধার্ত্তের মিছিল আর শিশুর কান্না। অভুক্ত মানুষ ধরণা দিয়েছে দেবতার মন্দিরে, কিন্তু ফল হয়নি। মুখ ফিরিয়ে রয়েছেন তাঁরা — কেন কে জানে? শস্যের দেবী ডিমিটার নাকি সাইপ্রাসের দিকে গিয়েছিলেন, তার পর হতে তিনি নিখোঁজ। দেবী দেবতাদের খেয়াল সাধারণের বোঝা দায়! কিন্তু দেবরাজ জিউস কি করছেন? কেন তিনি তাঁর ভগিনী ডিমিটারকে ফিরে আসতে আদেশ দিচ্ছেন না, বলছেন না নিজের কর্ত্তব্য করতে, কেউ তা বুঝে উঠতে পারছে না। এখন আর দেবতাদের পূজা দেওয়ার উপকরণ ও অবশিষ্ট নেই। না খেয়ে মরেছে গৃহপালিত পশু সব — বলি কই? সন্দেহ কি আরও রুষ্ট হবেন তাঁরা, কি না জানি শাস্তি নেমে আসবে মানুষের উপর! ভয়ে আশঙ্কায় দিশাহারা সবাই। শাসক হিসাবে সেলেউসের চিন্তা শুধু নিজের পরিবারের সদস্যদের নিয়েই নয়, এই ক্ষুদ্র জনপদের প্রত্যেকটি বাসিন্দার জন্য। শীতে এবার বরফ পড়েনি প্রায়। তবু যেটুকু পড়েছে, তার গলে যাওয়া জলে ভিজে ওঠা জমিতে লাঙল নামাবে চাষা প্রজারা, তাদের উৎসাহ দিতে সেলেউস নিজেও লাঙল ধরবেন এবার। তাছাড়া শীতশেষে শিকারের ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন — রাজভান্ডারে কিছু পশুমাংস জমানো থাকে — শীতের মরসুমে তাও শেষ। এবার বনেজঙ্গলে ঘুরে দেখতে হবে যদি এই নিদারুণ খরাতেও কোন পশু জীবিত থাকে, তার মাংস সংগ্রহ করা যায় কিনা। চিন্তা ভাবনা, ব্যবস্থাপনায় ক্লান্ত সেলেউসের রাতের ঘুমটা গভীর হয়। তাঁকে বিরক্ত না করে নিঃশব্দ পায়ে উঠে গিয়ে নিজেই একবার চারপাশটা দেখে আসা দরকার। ঘরের মাঝে সব ঠিক আছে বলেই মনে হচ্ছে, ছেলেমেয়েরা ঠিক আছে তো? চার মেয়ে রয়েছে পাশের মহলে দাসীদের তদারকিতে। তাদের দেখে আসার আগে শিশু পুত্র ডেমোফনের গায়ে হাত বুলিয়ে দেখার জন্য অন্ধকারেই অভ্যস্ত হাত বাড়িয়ে চমকে উঠলেন মেটানাইরা! বিছানার ঐ ধারটি খালি কেন? শিশুর ছোট্ট বিছানাটি কোথায় গেল? তার পরই মনে পড়ে গেল তাঁর — তাই তো ডেমোফনের জন্য কয়েকদিন আগে ভালো একটি ধাইমা জোগাড় হয়েছে। আজকাল সে সেই ধাইমা'র কাছে শোয়।

মেটানাইরা লক্ষ্য করেছেন যে, সব কিছু খারাপের মধ্যেও কিছু একটা ভালো থাকেই। এমন খরা না হলে এই ধাইমাটিকে কোথায় পেতেন? অবশ্য একে খুঁজে পাওয়ার কৃতিত্বটা তাঁর নয়, সেটা হল তাঁর মেয়ে চারটির। সে যাই হোক, একটু সাহায্যের তাঁর এসময়টা বড় দরকার ছিল। তিনি রাজরানী হলেও ঘরের কাজের দায়িত্ব তাঁর অন্যান্য গৃহিণীদের চেয়ে বেশী ছাড়া কম নয়। ঘরণী নিজেই নিজের ঘর সামলাবেন, তা সে কৃষকের ঘর হোক, বা রাজার, সমগ্র গ্রীসে এটাই প্রথা। প্রাসাদে দাস দাসী অবশ্য আছে গোটা কতক, তবু নিত্যকার শাক সব্জী ফলানো, ভাঁড়ারের মজুত সামগ্রী থেকে তালিকা বানিয়ে পরিবারের সকলের পছন্দমত সুপাচ্য সুস্বাদু খাবারের তালিকা বানানো, রাঁধাবাড়ায় নজর রাখা, সাহায্য করা, কোনটি তাঁর কাজ নয়? এসব ছাড়াও

কিছুদিন অন্তর অন্তর পরিধেয় কাপড় চোপড় ধুইয়ে আনা, কুয়ো থেকে জল তোলা সবই গৃহিনীর কর্ত্তব্য। সুতো কাটা, তাঁত বোনাতে তো গৃহিণী ছাড়া কারুর অধিকারই নেই। মেটানাইরারার কোলে কচি শিশু, ফুরসৎ কাকে বলে ভুলতে বসেছিলেন প্রায় তিনি ইদানীং। প্রায় কিশোরী হয়ে ওঠা মেয়ে কটির সাহায্য নিতে বাধ্য হয়েছিলেন তাই তিনি ক'দিন আগে। কুয়োর থেকে জল তুলে আনতে পাঠিয়েছিলেন তাদের চারজনকে। সারা জনপদে এখন একটিই কুয়োতে পরিষ্কার ও শীতল জল মিলছে। পানীয় জল আনতে রাজা প্রজা সকলেরই সেখানে যেতে হয়। প্রাসাদ থেকে একটু দূরে কুয়োটি, যেতে আসতে অনেকটা সময় যায়। বড় মেয়েটি আর কিছুদিনের মধ্যে বার বছর পূর্ণ করবে, স্বামীর ঘরে যাবে সে এবার। বিশেষ অনুমতি ছাড়া ঘরের চৌকাঠ ডিঙোবার অধিকার থাকবেনা আর তার, কিন্তু এখনও সে ঘরবন্দী নয়; তাই তারই রক্ষণাবেক্ষণে বাকী তিনটিকে দিয়ে কুয়োর ধারে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন মেটানাইরা। অন্যদিনের চেয়ে একটু বেশী সময় নিয়েছিল তারা সেদিন। মনে মনে যখন নানান্ চিন্তা করতে আরম্ভ করেছেন তিনি, ঠিক সেই সময় খুশীতে ঝলমলে মুখে কলসী কাঁখে ফিরে এসেছিল তারা, আর তাদের দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ব্যস্ততার দরুণ আজ অনেকদিন তাদের চুল আঁচড়ে, মুখ মেজে দেওয়ার সময় পাননি তিনি, আজও উড়োখুড়ো রুক্ষ্ম চুল নিয়ে রওনা হয়েছিল তারা। এখন চারজনেরই চুলের জট ছাড়িয়ে পরিষ্কার করে আঁচড়ে মাথার চারপাশে বেণী জড়ান, হাতমুখ ঝক্‌ঝক্ করছে। তিনি কিছু বলার আগেই খুশীতে ডগমগ হয়ে মেজ মেয়েটি বলল, 'জান মা, কুয়োর ধারে কি ভাল একজন বুড়ীমা বসে আছে! আমাদের কাছে ডেকে কত্ত আদর করল, কেমন কাঠের কাঁকই দিয়ে চুল আঁচড়ে বিনুনী করে দিল।' 'সে কিরে, কোথায় পেলি তাকে?' 'আহাঃ, বললাম না যে কুয়োর ধারে বসেছিল। আসলে বুড়িমাটা খুব দুঃখী জানো? এই খরাতে ওর বাড়ীর সবাই মরে গিয়েছে। একটাই ছেলে ছিল, পথে ডাকাতেরা তাকেও মেরে ফেলেছে।' 'আহারে! ' ছেলের মা মেটানাইরা'র চোখে এই অজানা ছেলে হারানো মা'য়ের দুঃখে জল এল। সত্যি, অন্নের সন্ধানে দেশ গাঁ ছেড়ে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের ঢল নেমেছে পথে — দুর্ভাগ্যের কাহিনীতে চারদিক ছেয়ে গেছে। আহা, না জানি কোন্ দূরের গাঁয়ের থেকে ছেলে হারানোর দুঃখ বুকে বয়ে নিয়ে ক্ষুধার্ত্ত ক্লান্ত দূর্ভাগা এই রমণী একা এত দূরে এসেছে। পথের শ্রমে আর বোধহয় এগোতে পারেনি। হঠাৎই বিদ্যুৎচমকের মত তাঁর মাথায় এই চিন্তাটি খেলে গেল। এই অসহায়া বৃদ্ধাকে তাঁর নিজের ঘরে আশ্রয় দিলে কেমন হয়। হোক্ না দুর্ভিক্ষ — অন্নের অভাব! কতটুকু আর খাবে সে; পরিবর্ত্তে যদি সে শিশু ডেমোফনকে ধরতে পারে, তবে তিনি অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরকর্ণার কাজে মন দিতে পারেন। ভাবা মাত্র মেয়ে চারটিকে আবার কুয়োতলায় ফেরৎ পাঠালেন তিনি, যদি তারা সেই বৃদ্ধাকে সাথে নিয়ে আসতে পারে। স্বামী সেলেউসকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন বোধ করলেন না — তিনি আপত্তি করবেন না, সেটুকু ভরসা মেটানাইরার আছে। স্ত্রীর ঘর গৃহস্থলীর কাজে হস্তক্ষেপ করেন না তিনি।

মেয়েরা যখন বৃদ্ধাটিকে নিয়ে ফিরল, তখন অবশ্য একটু অবাক হলেন মেটানাইরা, কারণ রমণীটি আদৌ বৃদ্ধা নয়। তার শরীর পায়ের থেকে মাথা পর্যন্ত কালো চাদরে ঢাকা বটে, কিন্তু মুখে তার জরার রেখা নেই। তবু কি এক অবর্ণনীয় বিষাদেই যেন তার মুখের চামড়া আকুঞ্চিত আর দেহটিও যেন সেই বিষাদেই ন্যুব্জ হয়ে রয়েছে। করুণার দ্রব্য হয়ে গিয়েছিলেন তিনি, হাত ধরে বসিয়েছিলেন তাকে আর তার পর মাটির পাত্র থেকে ঢেলে দিয়েছিলেন সুগন্ধি শীতল দ্রাক্ষার আসব। তাঁকে আরেকবার অবাক করে দিয়ে রমণী সবিনয়ে আসবের পাত্রটি ফিরিয়ে দিয়ে চেয়ে নিয়েছিল পুদিনার গন্ধে ভরা যবচূর্ণ মিশ্রিত শীতল জল। জলটুকু নিঃশেষে পান করার পর তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল সে, তারপর কালো বক্ষাবরণী সরিয়ে বুকে তুলে স্তন্যপান করিয়েছিল শিশু ডেমোফনকে, আর শিশুর ঠোঁট উপছে পড়েছিল অজস্র দুধের ধারা। বহুদিনের অর্দ্ধভুক্ত ক্লান্ত মেটনাইরার অপ্রতুল দুধে লালিত শিশু সাগ্রহে পান করেছিল সেই দুধ আর খুশীতে তার ছোট ছোট মুঠি আকাশের দিকে ছুঁড়েছিল বারবার। আর দ্বিধা করেন নি মেটানাইরা; সাথে সাথে সেই বৃদ্ধাকে প্রস্তাব দিয়েছিলেন ছেলের ধাইমা হয়ে তাঁর গৃহে বাস করার, আর বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ না করে সে তাঁর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েছিল। গত কয়েক সপ্তাহে মেটানাইরা বারবার নিজের এই সিদ্ধান্তের জন্য নিজের কাছে কৃতজ্ঞ বোধ করেছেন। মুখের কালো ঘোমটা সরায়নি ধাইমাটি, কিন্তু তার অফুরন্ত, অনর্গল বক্ষনির্যাসে ডেমোফন ক্রমশঃ নধরকান্তি হয়ে উঠেছে, থেকে থেকে তার খলখল হাসি প্রাসাদের প্রস্তর অলিন্দে ধ্বনিত

হয় । তবু মাঝে মাঝে সংশয়ের একটা ছোট্ট কাঁটা মেটানাইরার মনে মাথা তোলে যেন — রহস্যময়ী এই স্ত্রীলোকটি কি কোন জাদুকরী? তাকে এতটা বিশ্বাস করাটা কি ভুল হয়েছে? কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে চোখ রাঙান তিনি, ধাইমাটি যে তাঁর শিশু পুত্রটিকে ভালবাসে তাতে তো কোন সন্দেহ নেই । গৃহকার্যের মাঝে থেকে থেকেই দেখতে পান মেটানাইরা যে, সে পা মেলে বসে পরম সোহাগে আর মমতায় শিশুটিকে পায়ের উপর শুইয়ে কি এক নাম না জানা সুগন্ধি মলম মালিশ করছে আর ডেমোফন আরামে হাত পা নেড়ে খেলছে । তার যত্ন আর আদরেই ডেমোফনের কান্তি যেন প্রতিদিন আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠছে । এ জাদুকরীই হোক বা অন্য কিছু হোক, এর দ্বারা তাঁর শিশুর কোন ক্ষতি হবে না - নিশ্চিন্ত আছেন মেটানাইরা । আজ এই মূহুর্ত্তেও তাঁর মনে পুত্র সম্বন্ধে কোন আশঙ্কা জাগল না, বরঞ্চ বালিকা মেয়ে চারটির জন্যই একটু চকিত হলেন । পাশের মহলে উঁকি দিয়ে দেখে এলেন একবার — সারি বেঁধে শুয়ে আছে চারজনে । সেদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে ক্ষুদ্র একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়ল তাঁর । আর মাত্র ক'টা বছর, চলে যাবে এরা চারজনেই এক এক করে, জীবনে আর দেখা হবে না । তবে তার জন্য চোখের জল ফেলবেন না তিনি । যে মুহুর্ত্ত থেকে ওদের জন্ম দিয়েছেন, সেই মুহুর্ত্ত থেকেই এই বিচ্ছদের জন্য তিনি প্রস্তুত । সন্তান ধারণের ক্ষমতা জন্মানোর সাথে সাথেই মেয়েদের স্বামীর গৃহে যেতে হবে, এবং একবার সে গৃহের অন্ন গ্রহণ করলে আর সে গৃহের আঙিনা পার হয়ে চৌকাঠ ডিঙানোর অধিকার হারায় তারা — এ নিয়ম অলঙ্ঘনীয়, তা সে রাজার দুলালীই হোক্ বা হোক্ দরিদ্র ঘরের কন্যা ।

শয়নকক্ষের দিকে ফিরে যেতে যেতে থমকালেন আবার তিনি; অস্বস্তিটা যেন আবারও বুকের ভিতর চাড়া দিয়ে উঠল । ডেমোফনকে দেখেই আসা যাক্ একবার । ধাইমার ঘরের দিকে এগুতে এগুতে চোখে পড়ল রাতের চাঁদ হেকেটি দেবীর ম্লান আলো উঁচু ঘুলঘুলি থেকে প্রবেশ করেছে প্রস্তর অলিন্দের আনাচে কানাচে । অন্ধকার কিছু কিছু পাতলা হয়েছে সে সব খানে, কিন্তু তারই কোনায় কোনায় আরো গাঢ় হয়ে জমে উঠেছে ছায়া । এসময় ঘুম ভেঙে গেলে বুকের মধ্যে এমনিই ছাঁৎ করে ওঠে । অস্বস্তি লাগাটা স্বাভাবিক এসময় জেগে থাকলে । নাঃ, ডেমোফনকে একবার দেখে নিয়েই শুয়ে পড়বেন এবারে মেটানাইরা । এসব অনর্থক অস্বস্তিকে প্রশ্রয় দেবেন না আর! ভোর না হতেই তো নূতন করে শুরু হবে শতেক কাজের পালা ।

গুনগুন শব্দটা ঠিক সেই সময়ে কানে এল তাঁর । মন্ত্র পড়ছে কি কেউ কোথাও? সুর করে আওড়াচ্ছে কি কিছু? আর — আর — তার সাথে কি ওটা ? মুখটা উপরে তুলে জোরে শ্বাস টানলেন তিনি বার কতক — অগুরু আর লোবানের গন্ধ! যজ্ঞ হচ্ছে কোথাও — কিন্তু এই নিশুতি রাতে প্রাসাদ চত্বরে কে হোমের আগুন জ্বালে? কি আহুতি দেয় সে সেই আগুনে? কি চায় এলানে? — মেটানাইরা দৌড়াতে আরম্ভ করলেন । তিনি বুঝেছেন — বুঝতে পেরেছেন কিসের হোম, কে করছে হোম আর কি আহুতি দিচ্ছে সে । ছুটতে ছুটতে অস্ফূটে বলতে লাগলেন তিনি 'না-না-রক্ষা করো — হে মাতা হেরা - শিশুদের রক্ষাকর্ত্রী — রক্ষা করো, রক্ষা করো-'! পরমূহুর্তেই তাঁর তীক্ষ্ণ চিৎকার বিদীর্ণ করল প্রসাদের অন্ধকার, 'ডাইনী, রাক্ষসী, — কি করলি? কি করেছিস্ তুই? তোকে আমি — তোকে আমি —'

ডিমিটার

নিবিষ্ট মনে মন্ত্র পড়ছিলেন তিনি । মর্তের মানুষকে অমৃত প্রদান করা সহজ নয় । জন্মমূহুর্ত হতে নির্দ্ধারিত হয়ে যায় মানব শিশুর ভবিষ্যৎ । নশ্বর দেহ তার কাল অন্তে নষ্ট হয়ে যাবে আর ছায়ার মত আত্মাটি চলে যাবে পাতালের অন্ধকারে । কিন্তু এই মানবশিশুটিকে সেই পরিণতি হতে রক্ষা করতে তিনি বদ্ধপরিকর । দেবীবক্ষের অমৃত স্তন্যে পুষ্ট হয়েছে এর শরীর । এ শিশু দেবপদ বাচ্য । তাই তার শরীর হতে মৃত্যুর লেশ মুছে দিচ্ছেন তিনি আস্তে আস্তে । দিনমানে শতেক লোকের মাঝে এই প্রক্রিয়া করা যায়না, তাই এই নিশুতি রাতে আগুন জ্বালেন তিনি — আগুনের তপ্ত শিখার মাঝে শুইয়ে দিয়ে মন্ত্র পড়ে বিনষ্ট করে দেন তার শরীর হতে মৃত্যুবীজ । আজও সেই কাজে মগ্ন ছিললেন তিনি, খেয়াল করেন নি দ্বারের কাছে ছায়া পড়েছে কার । তীব্র তীক্ষ্ণ হাহাকারে চমকে উঠে ফিরে চাইলেন, মন্ত্র পাঠে ছেদ পড়ল মূহুর্তেকের জন্য, আর সেই মূহুর্তের ছেদে সর্বনাশ ঘটে গেল । অগ্নির যে দাহিকাশক্তিকে মন্ত্রের বলে সরিয়ে রেখেছিলেন, ফাঁক পেয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল শিশুর শরীরে, লেলিহান জিহ্বায় চেটেপুটে নিল তার নধরকান্তি সুকোমল দেহ । হাত পা নেড়ে অস্ফূট ধ্বনি তুলে

খেলছিল ডেমোফন এইমাত্র। আচমকা মর্মভেদী চিৎকার করে উঠল সে — আর তার পর পড়ে রইল অঙ্গারবর্ণ ক্ষুদ্র কয়েকটি অস্থি।

রুদ্ররোষে সোজা হয়ে দঁড়ালেন জগন্মাতা ডিমিটার, খসে গেল তাঁর কালো রঙের ঘোমটা আর উন্মোচিত হল মুগা রঙের আঁচলে ঘেরা তাঁর উজ্জ্বল মূর্তি, সোনালী চুলের উন্নত চূড়ার তলায় বিস্ফারিত হল তাঁর নীল নয়ন। ক্রোধে আরক্ত মুখ নিয়ে তিনি তাকালেন তাঁর পায়ের কাছে আছাড়ি পিছাড়ি খাওয়া মানবী মায়ের দিকে। তার কান্না তখন গোঙানিতে পর্যবসিত — 'ডেমোফন, আমার ডেমোফন। বাছা রে, কেন এই সর্বনাশীর হাতে তোকে দিয়েছিলাম আমি?' গোঙানির মাঝেই সন্তানহারা মায়ের কণ্ঠে রাগ ফুঁসে উঠল আবার — 'ওরে ডাইনি, তোকে আমি ছেড়ে দেব না — কেন কেন তুই ধাইমা'র রূপ ধরে কেড়ে নিলি আমার বাছাকে?' মাটিতে লুটিয়ে পড়া মেটানাইরা ক্রুদ্ধ নাগিনীর মত ফণা তুলে তাকালেন তাঁর সন্তানহন্ত্রীর দিকে, বড় ভরসায় যাকে শিশু পুত্র সঁপে দিয়ে শুতে গিয়েছিলেন তিনি; আর মূহুর্তে বিস্ময়ে বাক্‌রোধ হয়ে গেল তাঁর। অস্ফূটে বলে উঠলেন, 'দেবী ডিমিটার! আপনি? আমার ঘরে? সারা গ্রীস আপনাকে খুঁজছে দেবী —' আজন্মলালিত সংস্কারে জানু নত হয়ে এল তাঁর, কিন্তু অশ্রুর ধারা রইল অবিরল। ''মাতা, আমি কি দোষ করেছি, আমাকে বলুন। করুণা করুন মা — ফিরিয়ে দিন আমার পুত্রকে। যা আদেশ করেন, আমি সেই প্রায়শ্চিত্ত করব। আপনি যদি চান, আলো ফুটলেই যাগ যজ্ঞ করে দশটি বা বারোটি নধর বৃষ বলি দেব। শুধু একবার বলুন কি চান, তাই করব। শুধু আমার ডেমোফনকে আমার কোলে ফিরিয়ে দিন'। দেবী চেয়ে রইলেন মর্ত্য মানবীর দিকে আর চেয়ে থাকতে থাকতে ক্ষণপূর্বের ক্রোধের আগুন নিভে গিয়ে তাঁর চোখেও ধারা নেমে এলো।

মা — এও যে মা। এও তাঁর মতই সন্তান হারিয়েছে। শুধু এর সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে ভাগ্য আর তাঁর সন্তানকে কেড়ে নিয়েছে পুরুষ — যে পুরুষ শুধু তাঁর ভ্রাতাই নয়, তাঁর ধর্ষক, আবার তাঁর সন্তানের পিতাও বটে। পিতা হওয়া সত্ত্বেও সন্তান পালনের দায়িত্ব যে নেয়নি, কিন্তু সেই সন্তানকে সে ক্রুর নিষ্ঠুরতায় তুলে দিয়েছে আরেকটি পুরুষ - তাঁদেরই আরেকটি ভ্রাতার লালসা তৃপ্ত করতে। তাঁর পার্সিফোনি — নিষ্পাপ সরল শিশু কন্যা, নীল আকাশের নীচে সোনালী রৌদ্রের মাঠে যে ফুল তুলে খেলে বেড়াতো, সেই আজ পাতালের অন্ধকারে নিজের প্রায় বৃদ্ধ খুল্লতাত/মাতুলের অসহায় অঙ্কশায়িনী। গুমরে উঠলো দেবীর মন, 'কোরে-নিষ্পাপ কুমারী কন্যাটি আমার, তোর না জানি কত কষ্ট হচ্ছে, ভয় করছে সোনা! তুই কি মনে মনে ভাবছিস যে তোর মা কোথায়, কেন তোকে এসে ঐ অন্ধকার হতে উদ্ধার করছে না? কেন তোকে বাঁচাতে পারিনি পুরুষের লালসার গ্রাস হতে? ঐ যে সেদিন সিসিলির সবুজ ঘাসের মাঠে তোকে বন্ধুদের সাথে খেলতে রেখে সাইপ্রাসের চাষীদের নৈবেদ্য গ্রহণ করতে গেলাম, তখনই কেন বুঝতে পারিনি যে তোর উচ্ছল সরল সুকুমার রূপ দেখে আমারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেডিস্ কামোন্মত্ত হয়ে উঠবে আর তার কথায় — জিউস, তোর নিষ্ঠুর পিতা মাঠময় তোর নীল চোখের রঙে রঙ মিলিয়ে ফুল ফুটিয়ে তোকে ধরার ফাঁদ পেতে রাখবে? কেন বুঝিনি যে ফুল তুলতে আত্মহারা হয়ে তুই সেই ফাঁদে অনায়াসে ধরা দিবি?' ডিমিটার তাঁর জলে ভরা চোখের সামনে যেন স্পষ্ট দেখতে পেলেন আদিগন্ত রৌদ্রে মাখা মাঠের ঘাস ফুঁড়ে হঠাৎ উঠে এল হেডিসের কালো ঘোড়ার রথ আর পলকের মধ্যে হতচকিত পার্সিফোনিকে টেনে তুলে তা মিলিয়ে গেল পাতালের অন্ধকারে, পড়ে রইল মাঠ জুড়ে তার কোঁচড় ভরা ফুল। শুধু ঐ ফুলকটিই খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি সেদিন। ভীত কন্যার 'মা-মা' আর্তরব নীল আকাশে ঘুরে ঘুরে যখন কানে বেজে উঠেছিল, সাইপ্রাস যাওয়া হয়নি তাঁর। আশঙ্কায় কেঁপে উঠে মধ্যপথ হতেই ফিরেছিলেন তিনি, কিন্তু ততক্ষণে তাঁর 'কোরে' হারিয়ে গেছে পাতালের অন্ধকারে। সেই ফুলকটি হাতে করে দেবভূমি অলিম্পাস পর্বতের দুয়ারে দুয়ারে নিরুদ্দিষ্ট মেয়ের সন্ধানে ঘুরেছেন কতদিন, কিন্তু ক্রুর দেবরাজ জিউসকে ভয় না পায় কোন দেবী বা দেবতা? তাই মৌন থেকেছে সবাই। ব্যতিক্রম ছিলেন শুধু বৃদ্ধ দিনপতি হিলিয়াস। আকাশপথে যেতে হিলিয়াস সেদিন দেখেছিলেন ছোট্ট ভীরু কিশোরীটির অপহরণের দৃশ্য আর তিনিই শোকার্ত্ত ডিমিটারকে বলেছিলেন তাঁর কন্যার পাতালে হারিয়ে যাওয়ার ইতিহাস। কিন্তু সেই ঠিকানা জেনেই বা লাভ কি হল? আশ্চর্য — জগতের মাতা তিনি, তাঁর কৃপায় যবের শীষে ছড়া বাঁধে, গাছ নুয়ে পড়ে ফলের ভারে — নিখিলের ক্ষুধা মেটান তিনি, কিন্তু নিজের সন্তানের ভাগ্যের উপর তাঁর নেই কোনো অধিকার, কারণ তিনি নারী। তিনি

চাইলেও ফিরে পেতে পারেন না নিজের সন্তান!

শুধু সন্তান কেন, তাঁর নিজের ভাগ্যের উপর ও কি কোনো অধিকার ছিল তাঁর কোনদিন? ভ্রাতারা তাঁকে ধর্ষণ করেছে বারেবারে । কৌমার্য লুটে নেয় মধ্যম ভ্রাতা পোসাইডন । সমুদ্রের ঢেউয়ের চূড়ায় ত্রিশূল হাতে রাজ্য করে বেড়ায় সে, যখন খুশী তার পেশীবহুল দেহ আস্ফালন করে ডেকে আনে ধরিত্রীর বুক কাঁপিয়ে ভুমিকম্প । তাঁর দিকে নজর পড়তে বলশালী অশ্বের রূপ ধরে এসে চূড়ান্ত অপমানে তাঁকে ভোগ করেছিল একদিন, তার পর অবহেলায় ফেলে রেখে চলে যায় । সন্তান সেবারেও গর্ভ এসেছিল তাঁর — একটি নয়, দুটি সন্তান । পিতার মতই বলশালী ও গতিমান কন্যা ডেসপোয়নে ও পুত্র আরাইয়ন । মাকে কিন্তু ভালবাসে নি তারা । তাঁকে ফেলে রেখে তারাও ছুটে চলে গেছে একদিন বহুদূরে । তিনি মেনে নিয়েছেন তা, কষ্ট সহ্য করেছেন আপনমনে সোনালী শস্যের ভারে আর স্নিগ্ধ শান্তিতে ভরিয়ে দিয়ে পৃথিবীর বুক । কিন্তু এখানেই তো শেষ হয়নি । এবার তাঁর দিকে চেয়ে লুব্ধ হয়ে উঠেছে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, স্বয়ং দেবরাজ লম্পটশ্রেষ্ঠ জিউস । যেদিন সে তাঁকে ধর্ষণ করে ভোগ করার চেষ্টা করে, ছিল, বিদ্রোহ করেছিলেন তিনি । নাগিনীর রোষে ফুঁষে উঠে নাগিনীর রূপ ধরে মাটিতে প্রবেশ করতে চেয়েছিলেন তবু ছাড়া পান্‌নি তার কামুক আক্রমণের হাত হতে । জিউস মহানাগের রূপ ধরে তাঁকে পেঁচিয়ে ধরেছিল, কিছুতেই নিস্তার মেলেনি । সেদিনের সেই কলুষিত মিলনের ফল তাঁর কন্যা পার্সিফোনি । সে কিন্তু কলুষমুক্ত — বড় নিষ্পাপ আর মধুর । বুকের মাঝে লুকিয়ে রেখেছিলেন তাকে । আজ তাকে পাতালে হরণ করে নিয়ে গেছে কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেডিস্ আর তাতে সহাস্যে সহযোগিতা করেছে তার জন্মদাতা পিতা দেবরাজ জিউস । বিচার ভিক্ষা করে যখন রাজদুয়ারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি, কি নিষ্ঠুর ব্যঙ্গে তাঁকে দূর করে দেওয়া হয়েছিল । কোন অনুনয়, বিনয় দেবরাজ কানে তোলেনি তাঁর । তিনি অবশ্য জানতেন যে প্রার্থনায় ফল হবেনা । জিউস চিরকাল অকারণে নিষ্ঠুর, তা নাহলে যেদিন তিনি দেবলোক হতে দূরে মর্ত্যমানুষের বুকে সত্যিকারের ভালবাসা খুঁজে পেয়েছিলেন, সে তাকেও শেষ করে দিত না । কর্ষিত ক্ষেতের মাঝে চাষী ইয়াসিওনের প্রেমের আলিঙ্গনে বাঁধা ছিলেন ডিমিটার আর সেই মূহুর্তে জিউসের বজ্র আঘাত হেনেছিল তাকে । মানুষ হয়ে দেবীকে ভালবাসার অপরাধে প্রাণ গিয়েছিল ইয়াসিওনের, অথচ জিউস নিজে একের পর এক ধর্ষণ করে চলেছিল দেবী, মানবী নির্ব্বিচারে । অকারণ এই হত্যায় তিনি যখন পাগলিনীর মত অশ্রু ফেলেছেন, হা হা করে হেসেছিল সেদিন দেবরাজ !

আজ তাই ডিমিটার শূন্য বুকে হেথা হোথা ঘুরে বেড়াচ্ছেন । তিনি জানেন তাঁর অমনোযোগে রিক্ত হয়ে গেছে ফসলের ক্ষেত, চারিদিকে ক্ষুধার হাহাকার রব, শীর্ণ নিষ্পত্র গাছে ফল ধরে না আর । নৈবেদ্যের অভাবে দেবতারাও ক্ষুধার্ত, কিন্তু তিনি সেদিকে ফিরে চান না । কি হবে? মায়া, মমতা সব বৃথা, অর্থহীন । শুধু এই শিশুটি ডেমোফন তাঁকে বহুদিন পরে স্নেহের স্বাদ এনে দিয়েছিল । আজ তাঁর নিজের প্রমাদে তাকে হারালেন তিনি । ক্ষুদ্র একটি গলাখাঁকারিতে চোখ তুলে তাকালেন তিনি । লক্ষ্য করেন নি ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে আরেকজন, তার দিব্য বিভা বলে দিচ্ছে সে দেবতা । বুঝলেন ছদ্মবেশ ত্যাগ করে ধরা পড়ে গিয়েছেন দেবতাদের কাছে । তবু বিরক্ত হয়ে শুধোলেন, 'হারমিস্, তুমি এখানে?' অভিবাদন করল দেবদূত হারমিস্ । 'মাতা, আজ আপনার ছদ্মবেশ ত্যাগ করায় আমরা আপনাকে খুঁজে পেয়েছি । এবার আপনি ফিরুন মাতা । পৃথিবী আর দেবলোক ক্ষুধায় কাতর । আপনার শর্তে রাজী হয়েছেন জিউস্ । পার্সিফোনিকে রথ পাঠিয়ে পাতাল হতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে ।' 'কোথায় সে? তাকে দেখব আমি' — তীব্র চিৎকার করে উঠলেন ডিমিটার আর সেই ক্ষণে শীর্ণ রুক্ষ্মচুল ভয়ার্ত কন্যা তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর বুকে । 'মা, মা গো — তুমি কোথায় ছিলে? আমি কতদিন কিছু খাই নি শুধু তোমাকে ডেকে কেঁদেছি ।' পরম মমতায় তার চুলে হাত বুলিয়ে বললেন মাতা, 'এবার খাবি চল্ । ভালো হয়েছে যে ওখানকার কোন খাদ্য তোর মুখে ওঠেনি' । তার পরমূহুর্তে কি এক আশঙ্কায় কেঁপে উঠে তিনি বল্লেন, 'কিচ্ছু খাস্‌নি তো সোনা? একটি দানাও নয়?' 'না মা, কিছুটি না — শুধু — শুধু একদানা বেদানা । হারমিস বললো যে ক্ষুধা তৃষ্ণায় কাতর অবস্থায় সে আমাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে না ।' 'হারমিস, শয়তান! জিউসের ষড়যন্ত্রের কারিগর!' ডুকরে কেঁদে উঠলেন ডিমিটার । 'কি হল, মা? কি করেছি আমি? মোটে একটি দানা মাগো, আর কিচ্ছু খাই নি ।' 'ঐ একটি দানা যে তোকে চিরকালের মত পাতালের দাসী করে দিল সোনা

আমার। নারী যদি খাদ্যের একটি দানাও কোন পুরুষের ঘরে মুখে দেয় আর তার সেই পুরুষের ঘর ছাড়ার অধিকার থাকে না। —' পাশ থেকে সহাস্যে বলল হারমিস্, 'এত বিচলিত হবেন না দেবী। দেবরাজ একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন। আপনার কন্যা বছরের চারটি মাস এই আলোকোজ্জ্বল পৃথিবীতে আপনার সাথে বাস করবে, কিন্তু তার পর তাকে ফিরে যেতে হবে পাতালের রাজার অন্ধকারে — সেটিই তার স্বামীর ঘর।' 'তোমার দেবরাজকে বলে দিও এই চার মাসই আমি শস্য ফলাব, বাকি আট মাস থাকব কন্যার প্রতীক্ষায়' — হতাশা আর ঘৃণা মিশিয়ে কথা কটি ছুঁড়ে দিলেন দেবী। আর তারপর ভূলুণ্ঠিত ক্রন্দসী জননীটিকে পরম মমতায় তুলে নিলেন নিজের বুকের মাঝে। 'শোনো, মেটানাইরা। তোমার এই প্রাসাদের পাশে গড়ে তোলো আমার মন্দির। জেনে রাখো, সেখানে পূজা দিলে আমি ক্ষেত ভরে দেব ফসলে। আরো শোনো — আমি তোমাকে দেব আরেকটি পুত্র — নাম রেখ তার ট্রিপ্টোলেমাস। শুধু সেই পুত্রটিকে আমি শিখিয়ে দেব মাতৃত্বের মন্ত্র, যে মন্ত্রে বৃক্ষ আর ধরিত্রী হবে ফলবান। ট্রিপ্টোলেমাস হবে আমার প্রথম পূজারী, কিন্তু সে ছাড়া আর কোন পুরুষ জন্মরহস্যের সন্ধান জানবে না। আজ হতে আমি শুধু নারীদের পূজা স্বীকার করব। নবজীবনের চাবি কাঠি থাকবে যার হাতে সে হবে শুধু নারী — একমাত্র নারী।'

(গ্রীক পুরাণের গল্প অনুকরণে)

কাজী নজরুল ইসলামের বিবাহিত জীবন

এম. এম. খায়রুল আনাম

ইংরেজী ১৮৯৯ সালের ২৫শে মে, বাংলা ১৩০৬ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার, কাজী নজরুল ইসলাম পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুরুলিয়া গ্রামে জন্মান । আট বছর বয়সে পিতা কাজী ফকির আহমেদকে হারান । মা জাহেদা খাতুন । ছোটবেলার ডাকনাম 'দুখু মিয়াঁ' । শিক্ষার প্রথম হাতে খড়ি স্থানীয় মক্তবে, পরে প্রাইমারী স্কুল থেকে পাশ করেন ১৯১০ সালে । পেট চালাতে গ্রামের হাজী পাহলোয়ান শাহের মাজার ও মসজিদে খাদেমগিরি করতেন ও সাঁঝবাতি দিতেন । পিতৃহীন নজরুল স্থানীয় 'লেটো' কোম্পানীর গানের দলেও যোগ দেন । সে সময় তাঁর লেখা গান দেখে অনেকেরই কৌতূহল জাগে ।

১৯১১ সালে অল্প কিছুদিন বর্ধমানের মাথরুন হাই স্কুলে পড়াশুনা করেন । সে সময় কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক ঐ স্কুলের হেডমাস্টার ছিলেন । অর্থাভাব কাটাতে তাঁকে রাণীগঞ্জে বাবুর্চি ও আসানসোলে রুটির দোকানে হেল্পারের কাজ করতে হয়েছে । ১৯১৪ সালে তিনি ময়মনসিংহ নিবাসী এক পুলিশ ইনসপেক্টার কাজী রফিজুল্লার চোখে পড়েন । তিনি নজরুলের প্রতিভা দেখে তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নিজের গ্রাম সিমলায় আশ্রয় দেন এবং দরিরামপুর হাই স্কুলে এক বছর বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করে দেন । ১৯১৫ সালে ট্রান্সফার নিয়ে আবার রাণীগঞ্জে ফিরে এসে নজরুল শিয়ালসল রাজ স্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্তি হন । এখানেও মেধার জন্য তাঁর বিনা বেতনে পড়া এবং থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা হয় ।

১৯১৭ সালে দশম শ্রেণীতে পড়ার সময় নজরুল ৪৯নং বাঙ্গালী পল্টনে যোগ দেন । নওশেরাতে ট্রেনিং শেষ হলে করাচীতে পার্মানেন্ট পোষ্টিং হয় এবং নজরুলের 'ব্যাটালিয়ান কোয়ার্টার মাষ্টার হাবিলদার' হিসেবে পদোন্নতি হয় । করাচী থাকা কালে একজন পাঞ্জাবী মৌলভীর কাছে 'দেওয়ান-ই হাফিজ' ও অন্যান্য বিখ্যাত ফারসি সাহিত্য পাঠ করে মহৎ সাহিত্য ও মহাজীবনের দুর্লভ সন্ধান পান । করাচীতে আরব সাগরের পাড়ে বসে — মুক্তি, কবিতা সমাধি, রিক্তের বেদন, ব্যথার দান, হেনা — নামের যে সব কবিতা ও গল্প রচনা করেন, তার অসাধারণ ও বিস্ময়কর প্রকাশভঙ্গী একজন শক্তিধর প্রতিভার আগমন বার্তা জানাচ্ছিল ।

১৯২০ সালের মার্চ্চ মাসে বাঙ্গালী পল্টন ভেঙ্গে ফেলা হলে তিনি বর্ধমানের সাব রেজিস্টারের পদের প্রার্থী হয়ে দরখাস্ত করেন । পরের বছর জানুয়ারিতে তিনি কলকাতায় এসে বাল্যবন্ধু শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের মেসে ওঠেন । পরে তিনি কলকাতা মেডিকেল কলেজের সামনে ৩২নং কলেজ স্ট্রীটে থাকা শুরু করেন ।

৩২নং কলেজ স্ট্রীট আসলে ছিল 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সমিতি'র অফিস । ওখানে ঐ সমিতির পত্রিকার প্রকাশক ও কমিউনিষ্ট পার্টির বিখ্যাত নেতা কমরেড মোজাফফর আহমদ এবং 'মোসলেম ভারত' পত্রিকার কর্ণধার আফজালুল হক সাহেবও থাকতেন । এর পাঁচ ছয় মাস পরের এক ঘটনা । তাঁর এক অন্তরঙ্গ বন্ধু সুগায়ক শ্রী নলিনীকান্তের বর্ণনায় এইরূপ — 'নজরুলের দৈনন্দিন কার্যসূচী আমার জানা থাকতো ।' একদিন সারা বিকেলটা আড্ডা দিয়েছি । পরদিন সকালে ওকে না দেখতে পেয়ে আফজালুল হককে জিজ্ঞেস করাতে বললেন, 'সে ত কাল রাত্তিরে কুমিল্লায় চলে গেছে ।' আমি বললাম, 'কই কাল ত কিছু বললেন না ।' উনি বললেন, 'বলবে কি করে? কাল সন্ধ্যার পরই এক ভদ্রলোক এসে কি সব কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ কুমিল্লা যাবার প্রস্তাব করেন । মুহুর্ত্তের মধ্যে তা সমর্থন করে সঙ্গে সঙ্গে শিয়ালদহ যাত্রা ।' — ভদ্রলোক ছিলেন কুমিল্লার দৌলতপুর নিবাসী মি: আলী আকবর খান — বিখ্যাত প্রকাশক ।

দৌলতপুর যাবার পথে খান সাহেব ও নজরুল কান্দিরপাড়, কুমিল্লায় শ্রী ইন্দ্রকুমার সেনগুপ্তর বাড়ীতে থেকে যান । ইন্দ্রকুমার কুমিল্লা কোর্ট অব ওয়ার্ডসের

ইন্সপেক্টর হিসেবে কাজ করতেন । ইন্দ্রকুমারের ছেলে বীরেন্দ্রকুমার কুমিল্লা জেলা স্কুলে পড়ার সময় আলী আকবর খানের সহপাঠী ছিলেন । বীরেন্দ্রকুমারের বাড়ীতে বাবা ইন্দ্রকুমার, মা, স্ত্রী, দুই বোন, ছেলে ছাড়াও থাকত বিধবা পিসী গিরীবালা দেবী ও তাঁর একমাত্র কন্যা প্রমীলা তথা আশালতা সেনগুপ্তা, যার ডাকনাম ছিল দুলী । আশালতার পিতা, শ্রী বসন্তকুমার সেনগুপ্তের আদি নিবাস ছিল মাণিকগঞ্জের মেহুতা গ্রামে । তিনি ত্রিপুরা সরকারের নায়েবের পদে চাকরী করতেন । পিতার মৃত্যুর পর প্রমীলারা কুমিল্লায় চলে এসে বীরেন্দ্রকুমারদের বাড়ীতেই বসবাস করছিলেন । কয়েকদিন থাকার পর আকবর খান সাহেব নজরুলকে নিয়ে তাঁর দৌলতপুরের বাড়ীতে যান ।

খান সাহেবের দুজন বিধবা বোন ছিলেন । একজন খান সাহেবের সংসারের সর্বময় কর্ত্রী ছিলেন । তিনি নজরুলকে মায়ের স্নেহে আদরযত্ন করতেন । অন্য বোনের বাড়ি কাছাকাছি ছিল । তাঁর একটি ছেলে ও একটি সুন্দরী যুবতী কন্যা ছিল, নাম সায়ীদা খাতুন ওরফে নার্গিস বেগম । নজরুল আসার পর এ বাড়ীতে ঐ বোনের যাতায়াত বেড়ে যেতে থাকে । সম্ভবত: নার্গিসের রূপযৌবন এবং নজরুলের বাঁশী পরস্পর পরস্পরকে আকৃষ্ট করেছিল । তাই কিছুদিনের মধ্যে তাদের বিয়ের কথা পাকাপাকি ও দিন ধার্য্য হয় । কুমিল্লার সেই পল্লীগ্রাম থেকেই নজরুল ও খান সাহেব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বিয়ের খবর দেন ও আমন্ত্রণ জানান । কিন্তু প্রথমত: নানা কারণে অনেকেই খান সাহেবের উপর ঠিক সন্তুষ্ট ছিলেন না । অপরপক্ষে নজরুলের কাঁচা বয়স, অস্থিতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থা ও সর্বোপরি অতিশয় সেন্টিমেন্টাল মনের কথা চিন্তা করে বন্ধুবর্গ ও হিতৈষীরাও বিয়ের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন । কিন্তু চিঠির উত্তরে কেউ প্রত্যক্ষভাবে না করতে পারেন নি ।

১৯২১ সালের ৫ই জুন শ্রী পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় নজরুলের চিঠির জবাবে লেখেন, 'ভাই নুরু, যখন তুই স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে তাকে বরণ করে নিয়েছিস, তখন অবশ্য আমার কোন দুঃখ নেই । তবে একটা কথা, তোর বয়স আমাদের চাইতে ঢের কম, অভিজ্ঞতাও তদ্রূপ, ফীলিং বা অনুভূতির দিকটা অসম্ভব রকম বেশী । কাজেই ভয় হয় যে, হয়তো বা দুটো জীবনই ব্যর্থ হয় । এ বিষয়ে তুই যদি কনসাস তাহলে অবশ্য কোন কথা নেই । যৌবনের চাঞ্চল্য আপাততঃ মধুর মনে হলেও ভবিষ্যতে না পস্তাতে হয় । লিখেছিস, এক পল্লীবালিকার কাছে এত বিব্রত আর অসাবধান হয়ে পড়েছি যে কোন নারীর কাছে কখনো হইনি । জেনে খুশী হলাম যে তাঁর বাইরের সৌন্দর্য্য ও যথেষ্ট আছে ।' ১৩ই জুন 'মোহাম্মদী' পত্রিকার আপার সার্কিউলার রোড অফিস থেকে সুসাহিত্যিক মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলী লেখেন, 'অভিন্নহৃদয়েষু ভাই নজরুল, আপনার ৭ তারিখের স্নেহমাখা চিঠিখানি আজ বিকালে পেয়ে কয়েকবার পড়েছি এবং অশান্তির মধ্যেও হেসেছি । নিভৃত পল্লীর যে কুটীরবাসিনীর (দৌলতপুরের শাহজাদী বলাই বোধ হয় ঠিক, তাই না?) সাথে আপনার মনের মিল ও জীবনের যোগ হয়ে গেছে তাঁকে আমার শ্রদ্ধা ও প্রীতিপূর্ণ আদাব জানাবেন । আমার বোধ হয় আপনার বন্ধুরা অসন্তুস্ট হয়েছেন একটা কারণে । আপনি 'নারায়ণ' এ 'দহনমালা' লিখে নারীর কাছে ক্ষমা চাইলেন । তার পরেই এত সত্বর প্রেমের ফাঁদে ধরা পড়লেন? যৌবনের জোয়ার বড় সাংঘাতিক, তাকে ঠেলে রাখা বড় দায় — এ আমি স্বীকার করছি ।' এরপর ১৬ই জুন তারিখে লেখেন, 'ভাই নজরুল, ... আপনার বিয়ের খবরটা তাড়াতাড়ি এই সপ্তাহের কাগজে বের করে দিয়েছি । কিন্তু ভয় নেই । আপনার শ্রীমতীর কোন নামই ছাপা হয়নি ।'

মোজাফফর আহমেদ সাহেব ৫১নং মির্জ্জাপুর স্ট্রীট কলকাতা থেকে লেখেন, 'ভাই কাজী সাহেব, ওয়াজেদ মিয়ার চিঠিতে জানলুম যে, ৩রা আষাঢ় আপনাদের বিবাহ হচ্ছে । সময় খুবই সংকীর্ণ — কাজেই আমার আর যাওয়া হচ্ছে না । তবে ভালয় ভালয় সব মিটে যাক, এ প্রার্থনা খোদার দরগাহে ।' পরদিন ২৬শে জুন নজরুলকে এক অত্যন্ত গোপনীয় পত্রে লেখেন, 'পরম প্রীতিভাজনেষু, কাজী সাহেব, আপনার পত্রাদি আর মোটেই পাওয়া যাইতেছে না । তার কারণ কি ? .... খান সাহেবের নিমন্ত্রণপত্র পাইয়াছিলাম । পত্রখানা আপনারই মুসাবিদা করা দেখিলাম । পত্রের ভাষা দু এক জায়গায় বড় অসংযত হইয়াছে । একটু যেন দাম্ভিকতা প্রকাশ পাইয়াছে । আপনার হাত দিয়া অমন লেখা বাহির হওয়া কিছুতেই ঠিক হয় নাই ।

আমার ভয় হইতেছে যে, খান সাহেবের সংশ্রবে থাকিয়া আপনি না শেষে দাম্ভিক হইয়া পড়েন । অন্যে বড় বলিলে গৌরবের কথা হয়, আর নিজেকে নিজে বড় বলিলে অগৌরবের মাত্রাই বাড়িয়া যায় । 'মোহাম্মদী' (পত্রিকা) —

কে বিবাহের কথা ছাপিতে অনুরোধ করাটা ঠিক হইয়াছে কি? তাঁরা তো নিজ হইতেই ও খবর ছাপিতে পারিতেন। ..... বাস্তবিক আমার প্রাণে বড় লাগিয়াছে বলিয়া এত কথা বলিলাম। এই নিমন্ত্রণ পত্র আবার 'অপূর্ব নিমন্ত্রণ পত্র' শিরোনামে 'বাঙালী' (পত্রিকা)-তে মুদ্রিত হইয়াছে দেখিলাম। 'বাঙালী'-কে এই নিমন্ত্রণ পত্র কে পাঠাইল? — আপনার অঙ্কলক্ষ্মীকে এই অপরিচিতের বিনয় সম্ভাষণ জানাইবেন।'

মুদ্রিত নিমন্ত্রণ পত্রটিতে নজরুলের পিতা মরহুম কাজী ফকির আহমদ সাহেবের পরিচয় দেওয়া হয় চুরুলিয়ার 'আয়মাদার' বলে, আর নজরুলকে বলা হয় 'মুসলিম রবীন্দ্রনাথ।' সম্ভবতঃ এই দুটি কথাই ছিল মুজাফ্ফর সাহেবের ব্যথিত হওয়ার কারণ। ২১শে জুন তারিখে, মুজাফ্ফর সাহেব নজরুলের মামাশ্বশুর অর্থাৎ আলী আকবর সাহেবকে লেখেন, 'খান সাহেব, বিবাহের নিমন্ত্রণ পত্র পাইয়াছি, অবশ্য বিবাহ হইয়া যাওয়ার পরে। আগে পাওয়া গেলেও বোধ হয় স্ট্রাইকের জন্য যাওয়া তেমন সুসাধ্য হইত না। যাহা হউক, আশা করি ভালয় ভালয় শুভ কাজ শেষ হইয়া গিয়াছে।' তিনি গোয়ালন্দ-চাঁদপুর স্টিমার ও আসাম-বেঙ্গল রেলওয়ে কর্মচারীদের স্ট্রাইকের কথাই বলতে চাচ্ছিলেন।

যাই হোক, এত ঢক্কানিনাদ করে যে বিয়ের আয়োজন, সেই বিয়ের অঙ্কুরেই বিনষ্টি ঘটে। দৌলতপুর থাকা অবস্থায় আকবর খানের কিছু কিছু ব্যবহার নজরুলকে মানসিক ভাবে খুবই বিপর্য্যস্ত করে। এমন কি হবু বধুর কিছু কিছু আচরণ তাঁর কাছে একান্ত দুর্ব্যবহার বলে মনে হয়। অবস্থা ক্রমশঃ খারাপ হতে থাকলে খান সাহেব এক সময় নিজের ঘাড়ে দোষ না নিয়ে, এ বিয়ে ভেঙ্গে দেবার ফন্দি করেন। তিনি নজরুলের কাছে একটা বাড়তি প্রস্তাব আনেন যে, বিয়ের পরে নজরুলকে এই দৌলতপুরেই থেকে যেতে হবে। এটা নজরুলের পক্ষে মেনে নেওয়া কোন মতেই সম্ভব ছিল না।

নজরুলের বিশেষ আমন্ত্রণে বীরজাসুন্দরী দেবী (গিরিবালা দেবীর বোন, প্রমীলার মাসীমা) নৌকাযোগে বিয়ে বাড়ীতে আসেন, সেনগুপ্ত পরিবারের দশ-এগার জন সদস্যের সঙ্গে। নজরুল যখন বীরজা দেবীকে ঐসব অপমানের কথা জানান, তখন তিনি নজরুলকে এ বিয়ে করতে নিষেধ করেন। কিন্তু বিয়ে উপলক্ষে এত জানাজানি, এই উপলক্ষে এত লোক উপস্থিত হবার পর, অবস্থা বিবেচনা করে, একপ্রকার বাধ্য হয়েই নজরুল বিয়ের ঝামেলাটা চুকিয়ে ফেলার মনস্থ করেন। বিয়েটা আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পন্ন হয়েছিল সত্য, কিন্তু ইসলামি মতে কনজুমেটেড হয়নি, অর্থাৎ দাম্পত্য মিলন সাধিত হয়নি। বিয়ের রাতেই, সেই ঝঞ্ঝাময় আবহাওয়ার মধ্যেই, নজরুল কুমিল্লা যাওয়ার উদ্দেশ্যে দৌলতপুর ত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ তিনি কান্দিরপাড়ে সেনগুপ্তদের বাড়ীতে ওঠেন। কান্দিরপাড় থেকে কবি দুটি গুরুত্বপুর্ণ চিঠি লেখেন। প্রথমটি তিনি মামাশ্বশুর মিঃ খানকে বাবা-শ্বশুর সম্বোধন করে লেখেন ঃ

'বাবা শ্বশুর! আপনাদের এই অসুর জামাই পশুর মতন ব্যবহার করে এসে যা কিছু কসুর করেছে, তা ক্ষমা ক'রো সকলে। অবশ্য যদি আমার ক্ষমা চাওয়ার অধিকার থাকে। এইটুকু মনে রাখবেন, আমার অন্তর দেবতা নেহায়েত অসহ্য হয়ে না পড়লে, আমি কখনও কাউকে ব্যথা দিইনা। ..... আমিও আপনাদের পাঁচজনের মতন মানুষ, আমার গন্ডারের চামড়া নয়। কেবল সহ্যগুণটা বেশী। আমার মান-অপমান সম্বন্ধে কান্ডজ্ঞান ছিল না বা 'কেয়ার' করিনি বলে আমি কখনো এতবড় অপমান সহ্য করিনি, যাতে আমার 'ম্যানলিনেস' এ বা পৌরুষে গিয়ে বাজে — যাতে আমাকে কেউ কাপুরুষ, হীন ভাবতে পারে। আমি সাধ করে পথের ভিখারী সেজেছি বলে লোকের পদাঘাত সইবার মতন ক্ষুদ্র আত্মা হয়ে যাইনি। আপনজনের কাছ হতে পাওয়া অপ্রত্যাশিত এত হীন ঘৃণা, অবহেলা আমার বুক ভেঙে দিয়েছে। বাবা! আমি মানুষের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছি। ..... বাড়ীর সকলকে দস্তুরমতো সালাম-দোয়া জানাবেন — তাকেও ক্ষমা করতে বলবেন। যদি এ ক্ষমা চাওয়া ধৃষ্টতা না হয়। আরজ-ইতি।

চির-সত্য স্নেহসিক্ত — নুরু।

দ্বিতীয় যে চিঠিটি কান্দিরপাড় থেকে কলকাতার মুজাফ্ফর আহমদকে লেখেন, তা পেয়ে মিঃ আহমদ খুব কষ্ট করে (তখন ধর্মঘট চলছিল) কুমিল্লায় আসেন এবং নজরুলকে নিয়ে কলকাতা ফিরে যান। এর অল্পদিন পরে ৩/১ সি তালতলা লেনে মিঃ আহমদের বাসায় অবস্থান কালে নজরুলের বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে। এরপর নজরুল কয়েকবার কান্দিরপাড় গিয়েছেন এবং শেষপর্যন্ত প্রায় তিনবছর পরে, ১৯২৪ সালের ২৪শে এপ্রিল শুক্রবার,

কলকাতার হাজি লেনে আশালতা সেনগুপ্তা ওরফে প্রমীলা দেবীর সঙ্গে নজরুলের বিয়ে হয় । সে সময় হিন্দু-মুসলমানের এই বিয়েটা সিভিল ম্যারেজ হিসাবে হতে পারেনি, কারণ আশালতার বয়স আঠার বছরের ঢের কম ছিল । সেজন্য তাদের ইসলামী মতে বিয়ে হয় । এই ডবল জটিলতায় উভয় সম্প্রদায়ের লোকেরা চটে যান ।

আশালতার ডাকনাম ছিল 'দোলনাদেবী', সংক্ষেপে 'দুলী' । নজরুল দুলীকে প্রথম দেখাতেই ভালবেসে ফেলেন এবং সারাজীবন তাঁকে অসম্ভব ভাবে ভালবাসতেন । দোলনার গায়ের রং চাঁপাকলির মত ছিল বলে, নজরুল তাঁর দ্বিতীয় কাব্যের নাম দিয়েছিলেন, 'দোলনচাঁপা' । দুর্ভাগ্যবশতঃ দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের পর থেকে প্রমীলা দেবীর কোমর থেকে নীচের অংশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়ে । তখন নজরুল মনপ্রাণ দিয়ে স্ত্রীর সেবাযত্ন করেছেন । অতীব দুঃখের বিষয়, মাত্র দু'বছরের মধ্যেই নজরুল নিজেই বাকশক্তি রহিত এবং মস্তিষ্কের দুরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়েন । দীর্ঘ ৩৮ বছর সংসার করার পর ৩০শে জুন, শনিবার ১৯৬২ সালে, মাত্র ৫২ বছর বয়সে প্রমীলা দেবী, কলকাতার পাইকপাড়ার বাড়ীতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন । এর ঠিক আগের বছর ১৯৬১ সালের ১১ই জ্যৈষ্ঠ, কলকাতার মির্জাপুর স্ট্রীটের নজরুল পাঠাগারে নজরুল জয়ন্তী অনুষ্ঠানের পর, যথারীতি পাইকপাড়ায় কবিকে দেখতে যাওয়ার রেওয়াজ অনুযায়ী, কবি ও কবিপত্নীকে পাশাপাশি দুই চৌকিতে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পাওয়ার বিরল সৌভাগ্য আমার হয়েছিল ।

যাই হোক, পরের দিন রবিবার সকালে, কবির অনেক দিনের অন্তিমশয্যার অভিলাস অনুযায়ী কবিপত্নীর মৃতদেহকে কলকাতা থেকে চুরুলিয়া নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেই হাজী পাহলোয়ানের দরগাহের পাশে কবরস্থ করা হয় । প্রমীলা বাল্যকাল থেকেই সাহিত্য ও সঙ্গীতের প্রতি গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন । তাঁর কিছু কবিতা দ্বিমাসিক 'সাম্যবাদী' ও মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় ছাপা হয় । যতদিন পেরেছেন, ঐ অচল অবস্থায়ও স্বামীকে নিজ হাতে খাইয়ে দিতেন । কবির বন্ধু ও ভক্তদের প্রতি কবিপত্নী আজীবন অত্যন্ত আপনজনের মতো ব্যবহার করেছেন । সাংসারিক অস্বচ্ছলতার মধ্যেও তিনি কাউকে অভুক্ত অবস্থায় কখনও ফেরত যেতে দেন নি । কখনও কোন অভিযোগ করেন নি বা বিমর্ষ থাকেন নি ।

প্রথমা স্ত্রী নার্গিস খানমের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ হলেও নজরুল তাঁর কথা কখনো ভুলতে পারেন নি । অত অল্প বয়সে নার্গিস 'শ্যাম রাখি না কূল রাখি'র মতো বিভ্রান্তিকর অবস্থায় পড়ে স্বামীর সঙ্গে ঐ রাত্রেই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবেন, না নিজের পিতৃকুলের সম্মান রাখবেন বুঝে উঠতে পারেন নি । কিন্তু তিনি হাল ছাড়েন নি । নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য তিনি কুমিল্লার দৌলতপুর ছেড়ে ঢাকার কামরুন্নেছা গার্লস কলেজে পড়াশুনা করেন । তিনটি উপন্যাস ও কয়েকটি টেক্সট বুক লেখেন । উপন্যাস গুলির নাম — তাহমিনা, ধুমকেতু ও পথিক হাওয়া । তাহমিনা বিখ্যাত 'সোহরাব রুস্তম' উপন্যাসের অনুকরণে লেখা হয়েছিল । তাহমিনাকে রেখে রুস্তম যুদ্ধক্ষেত্রে চলে গিয়েছিলেন । তেমনি নজরুল ও নার্গিসকে রেখে যান । নার্গিসের জীবন যেন হুবহু তাহমিনার অনন্ত দুঃখ দুর্দশা ও বঞ্চনার ইতিহাস । বস্তুতঃ তাঁর সব উপন্যাস গুলোই লেখা হয়েছিল নজরুলকে ঘিরে ।

দীর্ঘ ১৬ বছর প্রতীক্ষার পর ১৯৩৭ সালের ৪ঠা নভেম্বর নার্গিস তাঁর মামার বন্ধু ময়মনসিংহ নিবাসী প্রফেসর হেলালুদ্দিন সাহেব ও মামাতো ভাই নওয়াজেশ মোহাম্মদ খানকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতার শিয়ালদহ হোটেলে নজরুলের সঙ্গে শেষ সাক্ষাত করেন । সাক্ষাতকালে মিঃ ওয়াজেদ আলী সাহেবও উপস্থিত ছিলেন । অতর্কিতে নার্গিসদেরকে দেখে নজরুল ভীষণ অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন । প্রথমে দুজনের কেউ কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারেন নি । পরে একটু ধাতস্থ হয়ে নজরুল নার্গিসকে বলেন, 'তুমি ঢাকা ফিরে যাও । আমি খুব সত্ত্বর ঢাকায় আসছি । সেখানেই এর একটা সমাধান করব ।' তিনি নার্গিসকে সাংসারিক নানা অস্বচ্ছলতার কথা বলেন এবং দুঃখ-দুর্দশাময় ভবিষ্যতের কথাও উল্লেখ করেন । এবং একথাও উল্লেখ করেন যে, প্রমীলা ও তাঁর মা নার্গিসকে তাদের সংসারে কিছুতেই বরদাস্ত করবেন না । এরপর ঢাকায় ফিরে গিয়েছিলেন নার্গিস, কিন্তু তাঁর ভাষায়, 'সেই সত্বর আর কখনো আসেনি ।'

পরবর্তীকালে, নার্গিস কবি আজিজুল হাকিমকে বিয়ে করেন । প্রায় ৮১ বছর বয়সে, ১৯৮৫ সালে, আমেরিকার একটা ছোট শহরে তিনি মারা যান । আর দেখা না করতে গেলেও, নজরুল তাঁর পরিত্যক্ত স্ত্রীকে এক অবিস্মরণীয় চিঠি লেখেন । তা থেকে সামান্য অংশ এখানে তুলে ধরা হলো :

'কল্যাণীয়াষু ! তোমার পত্র পেয়েছি — সেদিন নববর্ষার নব ঘন-সিক্ত প্রভাতে । পনর বছর আগে এমনি এক আষাঢ়ে, এমনি বারিধারার প্লাবন নেমেছিল — তা তুমি হয়তো স্মরণ করতে পার ..... আমার অর্ন্তযামী জানেন, তোমার জন্য আমার হৃদয়ে কি গভীর ক্ষত, কি অসীম বেদনা! কিন্তু সে বেদনার আগুনে আমিই পুড়েছি — তা দিয়ে তোমায় কোনদিন দগ্ধ করতে চাইনি । তুমি এই আগুনের পরশমাণিক না দিলে আমি অগ্নিবীণা বাজাতে পারতাম না — আমি ধূমকেতুর বিস্ময় নিয়ে উদিত হতে পারতাম না । তোমার যে কল্যাণরূপ আমি আমার কিশোর বয়সে প্রথমে দেখেছিলাম, যে রূপকে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ভালবাসার অঞ্জলি দিয়েছিলাম, সে রূপ আজও স্বর্গের পারিজাত-মন্দারের মতো চির অম্লান হয়ে আছে আমার বক্ষে ।

তোমার আজিকার রূপ কি, জানি না । আমি জানি তোমার সেই কিশোর মুর্তিকে, যাকে আমি দেবীমুর্তির মত আমার হৃদয়-বেদীতে অনন্ত প্রেম অনন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলাম । সেদিনের তুমি সে বেদী গ্রহণ করলে না । পাষাণ-দেবীর মতই বেছে নিলে বেদী-পীঠ । ..... জীবন ভ'রে সেইখানেই চলেছে আমার পূজা-আরতি। ..... যাক — আজ চলেছি জীবনের অস্তমান দিনের শেষ রশ্মি ধরে, ভাটার স্রোতে । তোমার ক্ষমতা নেই সে পথ থেকে ফেরানোর । আর তার চেষ্টাও করো না । তোমাকে লেখা এই আমার প্রথম ও শেষ চিঠি হোক । যেখানেই থাকি, বিশ্বাস করো, আমার অক্ষয় আশীর্বাদ কবচ তোমায় ঘিরে থাকবে । তুমি সুখী হও, শান্তি পাও — এই প্রার্থনা । আমায় যত মন্দ বলে বিশ্বাস কর, আমি তত মন্দ নই — এই আমার শেষ কৈফিয়ত । ইতি —

নিত্যশুভার্থী —

নজরুল ইসলাম

পি, এস — আমার 'চক্রবাক' নামক কবিতা-পুস্তকের কবিতাগুলো পড়েছ ? তোমার বহু অভিযোগের উত্তর পাবে তাতে । তোমার কোন পুস্তকে আমার সম্বন্ধে কটুক্তি ছিল । ইতি —

'জেন্টেলম্যান'

(কৃতজ্ঞতা স্বীকার : ১) আব্দুল কাদির সম্পাদিত 'নজরুল রচনা সম্ভার' থেকে উদ্ধৃতি, ২) বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, ৩) ইন্টারনেট)

লেখকের বক্তব্য — নজরুলের জীবনে 'ফজিলাতুন্নেসা' নামে আর এক বিদুষী মহিলার আবির্ভাব ঘটে । তিনিই প্রথম মুসলমান মহিলা, যিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গণিত শাস্ত্রে প্রথম হন এবং উচ্চশিক্ষার্থে বিলাত যান । এই সম্পর্কটি ক্ষণস্থায়ী ছিল, কখনও দানা বাঁধেনি বা বিয়ে পর্য্যন্ত গড়ায় নি ।

আকাপুল্কোয় আড্ডা

কৃষ্ণা চক্রবর্ত্তী

২০১৩ সালের শেষের দিকে একদিন আমাদের প্রিয় বন্ধু ও সহপাঠী সুভাষ বসুর কাছ থেকে e-সংবাদ এল, 'চল, আমরা সবাই মেক্সিকোর আকাপুল্কো শহরে কয়েক দিনের জন্য বেড়াতে যাই । ওখানে আমার টাইম-শেয়ার বাড়ি আছে, বেশ সস্তায় আমরা কয়েকদিন থাকতে পারব ।' আমরা মেক্সিকোতে অনেকবার গেলেও আকাপুল্কো কখনো যাইনি । তবে আসলে আকর্ষণটা আকাপুল্কোর প্রতি নয় । আমাদের পুরনো সহপাঠীদের সঙ্গে সময় কাটাবার সুযোগই পাই না । এখন মাঝে মাঝেই দুঃসংবাদ পাই যে আমাদের ছোটবেলার বন্ধুরা একে একে ইহলোক ত্যাগ করেছে । তাই সুভাষের এই স্নেহপূর্ণ প্রস্তাবটা প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না । সুভাষ খুব বন্ধুবৎসল মানুষ । সবার খোঁজখবর রাখে । ওর ধারণা যে ওর কোন শত্রু নেই । ও সব ই-মেইল ইংরাজিতে "lovingly" বলে সই করে এবং সেই জন্য ওকে অনেকের ঠাট্টা ও টিটকারি সহ্য করতে হয় । সবাইকে ভালবাসলে সে ভালবাসার কোন মূল্য থাকে না । তবে সেই কারণেই আবার কয়েকজন রাজি হয়ে গেল । আমরা ছাড়া আরো তিনজন আকাপুল্কো যাবার জন্য প্রস্তুত হলাম ।

আমি এবং আমার স্বামী আনন্দ সুভাষের সঙ্গে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে জৈব রসায়নে এম এস্‌সি পড়েছি । আমাদের সঙ্গে ওই একই ক্লাসে ছিল শংকর আঢ্য (আড্ডি) । তার সঙ্গে সুভাষ আই এস্‌সি এবং বি এস্‌সি করেছে বিদ্যাসাগর কলেজে । আবার বিদ্যাসাগর কলেজে সুভাষ আর শংকরের সঙ্গে বি এস্‌সি করেছে রণজিৎ চক্রবর্ত্তী । তবে রণজিৎ আমাদের সঙ্গে জৈব রসায়ন পড়েনি । ও ইন্জিনিয়ার । আমরা সবাই কোন না কোন সময়ে সুভাষের সহপাঠী ছিলাম । এছাড়া আমাদের সঙ্গে যাবে সুভাষের স্ত্রী মঞ্জু আর রণজিতের স্ত্রী সুনন্দা । দুই মহিলাই বিদুষী ও নানা গুণের অধিকারিণী । যাদের কথা বললাম, আমি ছাড়া সবাই নানান কারণে বিখ্যাত তাদের কাজের জন্য । সবারই বয়স সত্তরের উপর । যারা অবসর নিয়েছে তারাও অনেক রকম কাজের দায়িত্ব নিয়েছে । সবাই নানান দেশে ভ্রমণ করেছে । অনেক কিছু পড়েছে, দেখেছে, শুনেছে । তবু তারা আকাপুল্কো যেতে রাজী হল । কারণটা কি?

অন্যান্য কারণ অনেক থাকতে পারে, তবে একটা কারণ হচ্ছে এই যে জীবনের সায়াহ্নে আমরা সবাই আমাদের প্রথম জীবনের মধুরাম্ল স্মৃতিগুলো ফিরে পেতে চাই । আরেকবার আস্বাদন করতে চাই জীবনপ্রত্যুষের স্বপ্নগুলো । তখন আমরা কেউ ভাবিও নি যে আমরা এতদিন বাঁচব বা ভারতবর্ষ ছেড়ে অন্য কোন দেশের নাগরিকতা গ্রহণ করব । ছেলেবেলার দিনগুলো আর ফিরে আসবে না, কিন্তু ওই যুগের বন্ধুদের সঙ্গে এই আলোচনা করার সুযোগ যদি পাওয়া যায়, সেটাই বা মন্দ কি? কজন লোকে এমন সুযোগ পায়? তাও বা আকাপুল্কোর মতন এমন সুন্দর পরিবেশে । আমি জানি না সুভাষ আরো কাউকে বলেছিল কিনা এবং কেউ না বলেছিল বলে আমরা যাবার সুযোগ পেলাম। সেই ব্যাপারে কিছু না ভেবেই আমরা সাদরে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম ।

মে মাসের ১৭ তারিখ যাবার দিন স্থির হল । এক সপ্তাহ থাকব । যাবার প্রস্তুতি আরম্ভ হল । সুভাষ আমাদের বলে দিল বিমানবন্দরে গিয়ে কি ভাবে Mayan Resort এ যেতে হবে । ওখানে গিয়ে কার সঙ্গে যোগাযোগ করতে

হবে। ওখানে নাকি সলোমান নামক একটি ছেলে আছে। সেই একমাত্র ইংরাজি জানে। তাকে খুঁজে বার করতে হবে। সেই সব ব্যবস্থা করে দেবে। তা ছাড়া একটা ভ্রমণসূচী তৈরী করা হল যাতে প্রত্যেকের নিজেদের এবং ছেলেমেয়েদের ফোন নম্বর, ই-মেইল ঠিকানা ইত্যাদি সব কিছু একত্র করা হল এবং সবাইকে পাঠান হল যাতে কোন দরকার পড়লে সবাইকে খবর দেওয়া যেতে পারে। যারা যাচ্ছে, সবাই নানান দেশে ভ্রমণ করতে অভ্যস্ত। তাছাড়া স্বামী স্ত্রী এরসঙ্গে রয়েছে। সুতরাং আমরা ভাবলাম আমরা এবার যাওয়ার জন্য প্রস্তুত।

বাকি সবাই নানান শহর থেকে ১৭ই মে আকাপুল্কো পৌঁছোবে ঠিক হল। শুধু আমরা দুজন শিকাগো থেকে ১৮-ই মে রওনা হব বলে ঠিক করলাম। তার কারণ আমাদের শিকাগোর বাঙালিদের ১৭ তারিখ বঙ্গসংস্কৃতি দিবস পালন করার কথা ছিল। তাই আমরা সে অনুষ্ঠানটা দেখে তার পরদিন যাব ভাবলাম।

পরদিন, মানে মে মাসের আঠারো তারিখে, আমরা ভোরবেলা উঠে আকাপুল্কো যাত্রা করলাম। আমরা হ্যুস্টনে বিমানবদল করে দুপুর দুটোর মধ্যেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলাম। আকাপুল্কোতে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসে। সুতরাং ওদের ব্যবস্থা খুব ভাল। আমাদের যেখানে যাবার কথা সে জায়গাটার নাম Mayan Resort। বিমানবন্দরের খুবই কাছে। দশ মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেলাম। ট্যাক্সিচালক এই জায়গাটা ভাল চেনে। আমাদের নামিয়ে দিয়ে হুট্ করে চলে গেল। অপেক্ষা করল না দেখার জন্য যে আমরা ঠিক জায়গায় এসেছি কিনা। ওদিকে আমরা ভেতরে গিয়ে যখন

আমাদের দলের খোঁজ করলাম, শুনলাম আমদের কোন রিজার্ভেশান ওখানে নেই। শ্রীমান সলোমান, যে আমাদের যে কোন বিপদ থেকে উদ্ধার করবে বলে শুনে এসেছিলাম, সে নিজেই নাকি ছুটি উপভোগ করতে কোথায় চলে গেছে। আমরা ভ্যাবাচাকা খেয়ে হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে পড়লাম। এখন আমরা কোথায় যাই? কি করি?

আমাদের এরকম উদ্বাস্তুর মত অবস্থা দেখে দয়াপরবশ হয়ে এক হোটেলের কর্মচারী আমার দিকে এগিয়ে এল। আমাকে দেখে বুঝল যে আমি ভারতীয়। আমাকে বলল ইংরাজিতে, 'তোমরা কি বাসুর আত্মীয়?' আমি উৎফুল্ল হয়ে ঘাড় নাড়লাম। আমরা যে ঠিক আত্মীয় নই, সেটা আমার মাথায় এল না। লোকটা বলল, 'তোমাদের কোন চিন্তা নেই। তোমাদের দলবল কাছাকাছি আছে। আরো ভাল জায়গায় আছে। এটা Mayan Resort, ওরা আছে Grand Mayan Resort-এ। এই complex-এর ভেতরেই। তোমরা এই শাট্‌ল্ এ করে চলে যাও। ওরা জায়গা বদল করেছে। তোমাদের তো জানিয়ে দেবে বলেছিল।'

আমরা চলে এলাম এক মায়াপুরী থেকে আরেক মায়াপুরী। জায়গাটা খুব সুন্দর, তবে ঠিক হোটেলের মতন নয়। একটা বাড়ির মতন। যারা রয়েছে, তারা বোধ হয় প্রত্যেক বছর আসে। কোথায় কি আছে সব জানে। ঘরোয়া পোশাকে বা সাঁতারের পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। Washing machine-এর সামনে আড্ডা দিচ্ছে। কেউ ইংরাজি বলছে না। আমরা জানি না কোন দিকে যেতে হবে। আমাদের সামনের অফিসে বলে দিল ওদিকে একটা ন-তলা বাড়ি আছে। সেখানে তোমাদের বন্ধুরা এসে গেছে। তোমরা চলে যাও। আমরা আন্দাজে একটা খোলা বারান্দা দিয়ে আস্তে আস্তে আমাদের carry-on luggage টানতে টানতে এগোতে লাগলাম। ডান দিকে তাকিয়ে দেখলাম সুন্দর সমুদ্রসৈকত, ঝকঝকে বালি এবং একটা ক্যাফেটেরিয়ার কাঁচের জানালা থেকে দেখা গেল পাঁচজন নরনারী খুব উত্তেজিত হয়ে হাত-পা নেড়ে কি সব বলছে এবং খাওয়া দাওয়া করছে। আরে, এরাই তো আমাদের বন্ধুরা! সুভাষ, মঞ্জু, শংকর, রণজিৎ, সুনন্দা। এতক্ষণে পাওয়া গেল। আমরা আমাদের মালপত্র নিয়েই রেস্টোরান্টে ঢুকে পড়লাম। এই মূহুর্ত থেকেই আমাদের reunion আরম্ভ হল। আমাদের এতটা ভোগান্তি হত না, যদি এরা কেউ

আমাদের জানিয়ে দিত যে থাকার জায়গাটা বদলে গেছে। তার আগে তো অনেক কষ্ট করে আমাদের ফোন নম্বর নেওয়া হয়েছিল। আমরা সবাই বৃদ্ধবৃদ্ধা। ভিমরতি সবারই একটু আধটু ধরেছে। তাছাড়াও কারো হাঁটু ব্যথা, কারো চোখ খারাপ, কেউ কানে শোনে না, কারো ডায়াবেটিস, কারো হৃদ্‌রোগ। এই অবস্থায় যে কোনমতে এখান অবধি আসতে পেরেছি তাই যথেষ্ট।

এরপর থেকে আমাদের নেতাজী মানে সুভাষ বসু নেতৃত্ব গ্রহণ করলেন। আমাদের সাতজনের মধ্যে চারজন চক্রবর্ত্তী। আমরা ভেবেছিলাম আমাদের মতামত খাটবে, কিন্তু আমাদের মধ্যে মতের অমিল। তাই আমাদের ভোট খাটল না। সুভাষ আগে এখানে এসেছে। ও জানে কোথায় কি দেখার আছে। আমাদের সারথী ডেভিডকে ওই যোগাড় করেছে। একটা বড় ভ্যানে করে আমরা প্রথমে শান্তির গির্জাতে (Peace Church) এ গেলাম। আমরা ছটা বেজে পাঁচ মিনিটে পৌঁছে শুনলাম, ওটা ছটার সময় বন্ধ হয়ে গেছে। ডেভিড ওখানকার প্রহরীকে অনেক বোঝাল যে আমরা সবাই খুব মানীগুণী লোক, আমাদের জন্য ওদের গেট খোলা দরকার, কিন্তু দ্বারপালের মন গলল না। অগত্যা আমরা পরের স্টপএ গেলাম।

এবার আমরা আকাপুল্কো শহরের মাঝখানে জলের ধারে অনেকগুলো সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেলাম একটা রেস্টোরান্টে খাবার জন্য। এটা সুভাষ চয়ন করেছে, এখান থেকে নাকি Bungee-jumping ভাল দেখা যাবে। খুব ছোট্ট একটা টেবিলে গাদাগাদি করে বসলাম। দু-ফুট দূরে একটা swimming pool-এ সমুদ্রের নোংরা জল, তাতে একজন ছপছপিয়ে সাঁতার কাটছে। তার জলের ছিটা আমার গায়ে লাগছে। আমি ধারে বসেছিলাম। একটু পরে একটা লোক এল। তাকে আমরা বললাম কে কি খাব। এখন আমাদের সবারই নানারকম food restrictions আছে। আমাদের অর্ডার নিতে ওর আধ ঘন্টা লাগল। কেউ নুন খাবে না। কেউ মিষ্টি খাবে না। কেউ দুগ্ধজনিত কোন খাবার সহ্য করতে পরে না। কেউ মাছ মাংস মদ ছোঁবে না। কেউ মদ ছাড়া কিছু খাবে না। কেউ ভাত সহ্য করতে পারে না। কেউ গ্লুটেন-যুক্ত কোন পদার্থ হজম করতে পারবে না। কেউ গরুর মাংস বর্জন করে চলে। কারো চিংড়িতে অ্যালার্জি।

অর্ডারগুলো মনে রাখা শক্ত। একজন বলল আমাকে নুনছাড়া মার্গারিটা দাও। আরেকজন চাইল অ্যালকহল ছাড়া ককটেইল। কেউ খাবে দুধ ছাড়া আইস্ক্রিম। চতুর্থ জন চিজ ছাড়া কেসাদিয়া (quesadilla) তৈরি করতে বলল। কেউ নরম ক্যান্ডি খাবে বলল। শেষ পর্যন্ত সব খাবার যখন এল, তখন দেখা গেল যে তারা পরস্পরের খাবার চেখে দেখছে। 'দেখি, তোরটা কিরকম খেতে?' 'এই, তুই আমারটা একটু নে। আমি এতটা খেতে পারব না।'

ইতিমধ্যে আমি সবে আমার সিঙাড়ার মতন খাবারটায় একটা কামড় বসিয়েছি, সেই সময় একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার শুনে আমি চমকে উঠলাম। দেখলাম একটা অর্ধনগ্ন মানুষের দেহ উল্টো হয়ে হঠাৎ উপর থেকে আমার পাতের কাছে নেমে এল এবং একটা বিরাট হুংকার দিয়ে আবার উপরে উঠে গেল। এটা কি? এটা তো আমিষ মনে হচ্ছে। আমি তো নিরামিষ অর্ডার দিয়েছিলাম। খাবার উপভোগ করব কি, আমার তো ভয়ে আত্মারাম খাঁচাছাড়া হবার যোগাড়। একটু পরে বুঝলাম, Bungee jumping আরম্ভ হয়ে গেছে। এরপর একটার পর একটা লোক চেঁচাতে চেঁচাতে উপর থেকে লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ল আর উপরে উঠে গেল। আমার এই পরিবেশে কিছুই খেতে ইচ্ছা করল না। এই দেখার জন্য আমরা এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসেছি? সুভাষ যে কি ভেবে এই জায়গাটাকে খাওয়ার জন্য বাছল, সেটা আমার তো বোধগম্য হল না। কোনমতে আবার এতগুলো সিঁড়ি বেয়ে আমরা রাস্তায় গিয়ে উঠলাম এবং আমাদের বাড়িতে ফিরে গেলাম। আমি সেদিন আর কোথাও যেতেই পারলাম না। তবে শুনলাম বাকি সবাই

মিলে আরেকটা বাড়িতে, যেখানে শংকর, রণজিৎ ও সুনন্দা ছিল, সেখানে গিয়ে অনেক রাত অবধি আড্ডা দিয়েছিল। আমরা ও সুভাষ-মঞ্জু আরেকটা বাড়িতে ছিলাম। এই বাড়িগুলোতে দুটো করে শোবার ঘর আর মাঝখানে একটা রান্নাঘর আর বসার ঘর। সব ঘরে টিভি আর বাল্কনিতে বসার চেয়ার ও একটা ছোট্ট গরম জলের চানের টাব। ইচ্ছে করলে খুব আরামে থাকা যায়। আমরা অবশ্য নানারকম বাইরের জিনিস দেখতে ব্যস্ত ছিলাম। এতদূরে এসে ঘরের ভেতর বসে থাকব কেন?

এর পরের দিন প্রথমেই সেই গির্জাটা দেখতে গেলাম যেটা আগের দিন দেখতে পাই নি। এইটা হচ্ছে শান্তির গির্জা। এখানে গেলে সত্যি মনটা শান্ত হয়ে যায়। প্রাঙ্গনে একটা খুব উঁচু Cross রয়েছে, যা বহু দূর থেকে দেখা যায়। তারপর দিন একটা নৌকোয় cruise নিয়েছিলাম তখন দেখলাম যেখানেই যাচ্ছি, সেখান থেকেই ওটা দেখা যাচ্ছে। প্রার্থনাঘরটা ছোট্ট, বসার চেয়ারগুলো এবং পাদ্রীর ভাষণ দেওয়ার মঞ্চ সবই পাথরের তৈরি। কেউই ভাঙতে পারবে না বা পুড়িয়ে দিতে পারবে না। চারপাশে নানারকম ফল ও ফুলের গাছ। আমরা যখন গিয়েছিলাম, তখন জায়গাটা ফাঁকা ছিল, সুতরাং সহপাঠীদের সঙ্গে অনেকগুলো ছবি তোলার সুযোগ পাওয়া গেল।

এরপর যে জায়গায় গেলাম সেটার জন্য আকাপুল্কো বিখ্যাত। ওখানে সমুদ্রের ধারে একটা উঁচু দূরারোহ পর্বতশিখর থেকে কয়েকজন সাহসী মানুষ জলের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের বলা হয় cliffdiver (পর্বতলম্ফক)। এরা বাপঠাকুরদার আমল থেকে এই ঝাঁপ দিয়ে আসছে। ১৪ বছর বয়স থেকে ৬০ বছর বয়স অবধি লাফাতে পারে। এদের আবার নিজেদের য়ুনিয়ান আছে। একটা বয়সের পর থেকে যখন ওরা লাফাতে পারে না, তখন এই য়ুনিয়ান থেকে এরা retirement benefit পায়। এখানে নাকি মেয়েরা ঢুকতে পারে না। এইটা কাছ থেকে দেখার জন্য আবার অনেক সিঁড়ি বেয়ে নামতে হয়। তবে গতকালের অভিজ্ঞতার পর আমরা কেউ আর নামতে চাইলাম না। উপরেই একটা রেস্টোরান্টের বারান্দা থেকে দেখলাম। এখানে খাওয়াটা বেশ শান্তির সঙ্গে করা গেল। এই লোকগুলো যে শুধু ১০০ ফিট উপর থেকে লাফায় তা নয়, আবার ওই পাহাড়ের গা বেয়ে শিখরে আবার উঠেও পড়ে। তার একজন আমাদের খাওয়ার টেবিলের কাছেই এসে দাঁড়াল। ওর ইচ্ছে আমরা ওর সঙ্গে ছবি তোলাই আর তার জন্য ওকে টাকা দি। কিন্তু তা আর হল না। ওই ছবি কাকে আর দেখাব? এবার একটা facebook page করাতে হবে। এই সব বিদ্‌গুটে ছবি ওখানেই চলে।

পরের দিন সুভাষ-মঞ্জু South Bend ফিরে এল। ওদের একটা বিয়েতে যেতে হবে। আমরা আরো দুদিন ছিলাম। নিজেরাই কটা জিনিস দেখেছি। আমরা যে নানান জায়গায় খরচ করছিলাম, সুনন্দা তার হিসেব রাখার দায়িত্ব নিয়েছিল। কয়েকদিন পর খুব সুন্দর করে একটা Excel spreadsheet করে আমাদের সবাইকে পাঠিয়ে দিল। আমরা বুঝলাম, কাকে কত দিতে হবে। এই কাজটা আমরা আর কেউ হয়তো পারতাম না।

এই ছোট্ট আড্ডার গল্প লেখার ভার নিলাম আমি। পঞ্চাশ বছর আগে যখন আমরা ছাত্রছাত্রী ছিলাম, তখন একবার দক্ষিণ ভারত বেড়াতে গিয়ে একটা গল্প লিখেছিলাম। ওটাই আমার লেখার হাতেখড়ি। সে কাহিনীর নাম ছিল 'ডান দিকে খাদ নেই'। সে গল্পটা জমিয়ে রাখলে হত। আমাদের ব্যবহার তখন কিরকম ছিল সেটা মনে পড়ত। তার পর থেকে একটার পর একটা ভ্রমণের গল্প লিখেই যাচ্ছি। এগুলো কেউ পড়ে কিনা জানি না। নিজে পড়ে নিজেই আনন্দ পাই। এবার আশা করে থাকব আরো পঞ্চাশ বছর পরের যাত্রাটা কেমন হবে জানার জন্য। আজকে যারা এই কাহিনীটা পড়ছেন, তার মধ্যে কেউ কেউ হয়তো তখনো থাকবেন।

জুলাই ১৫, ২০১৪

পার্থর বনবাস

খনা দেব

ইন্দ্রপ্রস্থের সুন্দর সাজানো বাগানে এক নির্জন দুপুরে, পার্থ ছায়া ঘেরা সরোবরের ধারে গাছের ডালে টাঙানো হ্যামকে শুয়ে আকাশে মেঘের সাথে রোদের খেলা দেখছিল। নিজের ভাগ্যের কথা ভেবে অভিমানে ভরে আছে তার মন। এইতো সেদিন কত আশা নিয়ে ব্রাহ্মণের বেশে কৃষ্ণার স্বয়ংবর সভায় গিয়েছিল পাঁচ ভাই মিলে। দূর থেকে কৃষ্ণাকে দেখে তার চোখে পলক পড়ছিল না। ধৃষ্টদ্যুম্নের হাত ধরে যে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণা সভায় প্রবেশ করলো তার হৃদস্পন্দন গিয়েছিল বেড়ে। এমন অলৌকিক নারী মূর্ত্তি পার্থ জীবনে দেখেনি। শ্যামাঙ্গী কৃষ্ণার অনিন্দ্যসুন্দর দেহলতা ও উন্মথিত যৌবন পার্থকে করেছিল বিহ্বল। এই রমণীকে সম্পূর্ণ নিজস্ব করে পাওয়ার বাসনায় পার্থ উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠেছিল। মনে মনে প্রার্থনা করেছিল স্বয়ংবর সভায় অন্য রাজারা যেন লক্ষ্য ভেদ করতে অকৃতকার্য হন। কর্ণ যখন ধনু তুলে নিয়ে তাতে গুণ পরিয়ে শরসন্ধান করল, মুহূর্ত্তের জন্য পার্থর মনে হ'য়েছিল কৃষ্ণা হয়তো হাতছাড়া হ'য়ে যাবে। কিন্তু নির্ভীক স্পষ্টবাদিনী কৃষ্ণা ব'লে উঠলো সূতপুত্রকে সে বরণ করবেনা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পার্থ ভেবেছিল 'যাক বাঁচা গেল।' পার্থ বিনা ক্লেশে লক্ষ্য বিদ্ধ করবার পর কৃষ্ণার ঘন কালো চোখ দুটিতে যেন আলো জ্বলে উঠেছিল। দৃষ্টি দিয়েই সে মনের ভাব বুঝিয়ে দিয়েছিল। কৃষ্ণা সভা ভর্তি রাজা ও ব্রাহ্মণদের সামনে পার্থর বুকে বরমাল্য পরিয়ে দিল, আর পার্থর সারা শরীর ও মন শিহরিত হ'য়ে উঠলো, এই দৃশ্য তার মনে আজও গাঁথা হ'য়ে আছে। সেদিন পার্থর মনে হ'য়েছিল তার মতো সুখী ত্রিভূবনে আর নেই। কিন্তু হায়রে ভাগ্যের কি পরিহাস! আজ তার মানসলক্ষ্মীকে পাঁচ ভাই এর সাথে ভাগ ক'রে নিতে হ'য়েছে।

কৃষ্ণাকে বাড়ি আনার পর মা না দেখেই বলেছিলেন ভিক্ষে ভাগ করে নিতে, কিন্তু পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে দাদাকে বলেছিলেন 'আমি অন্যায় করে ফেলেছি, তুমি এর বিধান দাও।' দাদা অবশ্য প্রথমে ব'লেছিল 'যেহেতু পার্থ কৃষ্ণাকে জয় করে এনেছে, ও ই তার স্বামী।' কিন্তু কি কুক্ষণে যে ভালোমানুষ সাজতে গিয়ে পার্থর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়েছিল 'আমি অধর্মভাগী হ'তে চাইনা, পাঁচ ভাই মিলে কৃষ্ণাকে ভাগ ক'রে নেব।' যেমন বলা ওমনি দাদা পার্থর কথাটা যেন লুফে নিল। আসলে দাদাও নিশ্চয়ই কৃষ্ণার প্রতি আসক্ত হ'য়েছিল তা' না হ'লে শ্বশুরমশায়ের (দ্রুপদ রাজা) সাথে অত তর্ক করবে কেন? একমাত্র শ্বশুরমশায়েরই ইচ্ছে ছিলনা এক স্ত্রীর বহু পতি হয়। কিন্তু ধর্মের দোহাই দিয়ে দাদা পুরনো ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দেখিয়ে তর্ক ক'রে যেতে লাগল। করবে না? কৃষ্ণার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে যে! এর মধ্যে আবার ঠাকুর্দা (ব্যাসদেব) এসে উপস্থিত। বুড়োদের যেমন সব ব্যাপারে নাক গলানো স্বভাব! এই ভদ্রলোককে পার্থর মোটেও পছন্দ নয়। এর সঙ্গে ভীষ্মদাদুর কোনও তুলনাই হয়না। ভীষ্মদাদুর কি সুন্দর সৌম্য চেহারা, পার্থর প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব কারো অজানা নয়। হবেনাই বা কেন, পাঁচ ভাই এর মধ্যে সেইতো রূপে গুণে অতুলনীয়! ভীষ্মদাদুর কাছে এই ঠাকুর্দা নস্যি, দেখতে যেমন বাজে গায়ে তেমন গন্ধ। তবে এটা স্বীকার করতে হবে জ্ঞানে গুণে ইনি অতুলনীয়। ভুজুং ভাজুং দিয়ে শ্বশুরমশাইকে কি সব বুঝিয়ে দিলেন। পার্থরা পাঁচ ভাই নাকি ইন্দ্রের পাঁচ রূপ। দেবতার অবতার হওয়াতে এ'ধরনের বিয়ে নাকি সম্পূর্ণ বিহিত। আর কৃষ্ণা? সে তো যজ্ঞের আগুন থেকে বেরিয়েছে। পূর্বজন্মের কর্ম দোষে তার পতি লাভ হয়নি ব'লে সে নাকি কঠোর তপস্যা করে সর্ব্বগুণান্বিত পতি কামনা করেছিল। সেই তপস্যায় খুশী হ'য়ে মহাদেব তাকে বর দিয়েছিলেন 'পরজন্মে তোমার পাঁচটি ভরত বংশীয় পতি হবে।' যত্ত সব গাঁজাখুরি গল্প! কিন্তু বিজ্ঞ লোক ব'লে সবাই বিশ্বাসও করে ওনার কথা। ম্যাজিক ট্যাজিক দেখিয়েও তাক লাগিয়ে দেন। শেষ পর্য্যন্ত শ্বশুরমশাইকেও কেমন বাগে নিয়ে এলেন।

এদিকে কৃষ্ণাকে পার্থ একদম বুঝতে পারেনা। প্রথম দর্শনে মনে হ'য়েছিল তাকে দেখে কৃষ্ণা মন প্রাণ দিয়ে ফেলেছে, মনে হ'য়েছিল পার্থকে ছেড়ে সে থাকতেই পারবেনা। কিন্তু যখন শুনলো পাঁচ ভাই তাকে ভাগ করে

নেবে, তাতে কোনও বিকার দেখা গেলনা । সভার মাঝে যেমন জোর গলায় বলেছিল কর্ণকে বিয়ে করবেনা, ঠিক সেই ভাবেই তো ব'লতে পারতো 'আমি শুধু পার্থকেই ভালবাসি, ওকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবোনা ।' এসব বলাতো দূরের কথা, হাসি মুখে সব কিছু মেনে নিচ্ছে । এদিকে পার্থর হৃদয় যে ভেঙে চুরমার হ'য়ে যাচ্ছে তাতে কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই । একটু কাছে ডেকে কথা বলবারও উপায় নেই । কারণ এক পত্নীকে নিয়ে ভাই এ ভাই এ যাতে ঝগড়া না বাধে, সেই ভেবে নারদ মুনি আবার সুন্দ উপসুন্দ ও তিলোত্তমার গল্প ফেঁদে বসেছিলেন । সেই শুনে ভয় পেয়ে ঠিক করা হ'য়েছে কৃষ্ণা এক একজনের সাথে এক এক বৎসর থাকবে । সেই সময় অন্য কোনও ভাই যদি তাদের দেখে ফেলে, তাকে ব্রহ্মচারী হ'য়ে বার বৎসর বনবাসে যেতে হবে । পার্থর ধারণা কৃষ্ণাকে তার কাছে না থাকতে দেওয়ার জন্য সকলে মিলে একটা ফাঁদ পেতেছে ।

মনের দুঃখে পার্থ বাগানে টাঙানো হ্যামকে শুয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের দিকে মন দিতে চেষ্টা করলো । সরোবরের শীতল হাওয়ার সঙ্গে নাম না জানা ফুলের মিষ্টি গন্ধ ভেসে আসছিল । শুন্‌শান্ দুপুরে বাগানে শুয়ে চোখে ঘুম জড়িয়ে এসেছিল । ঠিক সেই সময় কয়েক জন ব্রাহ্মণ এসে পার্থকে শুয়ে থাকতে দেখে ক্রুদ্ধ স্বরে বল্লেন 'ইন্দ্রপ্রস্থে দুষ্টু লোকেরা আমাদের গরু চুরি করছে । যে রাজারা শুল্ক আদায় করেন অথচ প্রজাদের ধন রক্ষা করেননা, তারা পাপচারী । আমাদের ধন যে চোরে নিয়ে যাচ্ছে এক্ষুনি তার প্রতিকার করো । আরাম করে শুয়ে ঘুমোলে চলবেনা ।'

কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে দেওয়াতে পার্থর মনে মনে রাগ হ'লেও ব্রাহ্মণদের আশ্বাস দিয়ে বল্লো 'আপনারা বাড়ি যান, আমি এর ব্যবস্থা ক'রছি ।' ব্রাহ্মণেরা বাড়ি ফিরে গেলে পার্থর খেয়াল হ'লো এখন তো দাদার সাথে কৃষ্ণার থাকার পালা অথচ অস্ত্রাগারে যেতে হ'লে দাদার ঘরের ভেতর দিয়ে যেতে হবে । কৃষ্ণার সাথে দেখা হ'লে বনবাস অনিবার্য। কিন্তু ব্রাহ্মণদের কথা দিয়েছে, রাজা যদি প্রজাদের কথা দিয়ে রক্ষা না করেন সেটা অধর্ম করা হবে । পার্থর মাথায় হঠাৎ একটা দুষ্টু বুদ্ধি খেলে গেল । 'বনবাস হ'লে তো বেশ ভালই হয় । স্বাধীন ভাবে ঘুরে বেড়ানো যাবে । কৃষ্ণার উপেক্ষা আর সহ্য হচ্ছেনা । আমার মতো সুপুরুষ লোকের মেয়ে পেতে কোনও অসুবিধে হবেনা । পুরো দু'বছর অপেক্ষা ক'রে মাত্র এক বছরের জন্য কৃষ্ণাকে পাবো । তার চাইতে এই সুযোগে মেয়েদের সাথে বেশ আনন্দ ক'রে আসা যাবে । নারী সঙ্গ কোন্ পুরুষের না ভাল লাগে । কাউকে পছন্দ হ'লে বিয়ে করতেও বাধা নেই । পুরুষের বহু বিবাহ তো শাস্ত্র সম্মত ।' এই ভেবে পার্থ দাদার দরজায় টোকা মারল । যুধিষ্ঠির দরজা খুলে অবাক দৃষ্টিতে তাকাতেই পার্থ ব্রাহ্মণদের কথা জানিয়ে তাড়াতাড়ি অস্ত্র সংগ্রহ করে চোরেদের সন্ধানে বেরোল । রথে চড়ে ব্রাহ্মণদের ধন রক্ষা করে চোরেদের শাস্তি দিয়ে পার্থ দাদাকে এসে বল্লো 'দাদা আমি নিয়ম ভেঙেছি । আদেশ করো আমি বনে যাব ।' যুধিষ্ঠিরের মতে ছোটভাই দাদার ঘরে দরকারে এলে কোনও দোষ নেই, উল্টোটা হ'লেই নিয়ম ভঙ্গ করা হবে । পার্থ ভাবল 'এই রে দাদা আবার ঝামেলা বাধাবার চেষ্টা করছে ।' কিন্তু মুখে হাসি এনে বল্লো 'আমি ধর্মাচরণে ছল করবোনা ।' তারপর মনের আনন্দে গুরুজনদের প্রণাম করে বার বৎসরের জন্য বনে চলে গেল । সুরু হ'লো পার্থর আনন্দ স্ফূর্তির দিন ।

বহু দেশ ঘুরে পার্থ গঙ্গাদ্বারে পৌছল । একদিন স্নানের জন্য গঙ্গায় নামলে নাগরাজকন্যা উলুপীর সাথে দেখা হ'লো তার । উলুপী বল্লো 'আপনি আমার জন্য ভজনা করুন, এতে আপনার ব্রহ্মচর্য নষ্ট হবেনা, কিন্তু আমার প্রাণ রক্ষা হবে ।' পার্থ মনে মনে ভাবলো 'ব্রহ্মচর্যে মারো গুলি, তোমার মতো সুন্দরী রাজকন্যার সঙ্গ পাবো ব'লে বসে আছি ।' পার্থ উলুপীর প্রার্থনা পূর্ণ করলেন । উলুপী তাকে বর দিয়ে বল্লো 'তুমি জলেও অজেয় হবে ।' পার্থ ভাবলো 'যাক বাবা, মহিলার সঙ্গ লাভও হ'লো আবার বরও পাওয়া গেল ।'

উলুপীর কাছে বিদায় নিয়ে পার্থ নানা তীর্থে ঘুরে বেড়ালো । বারো বছর তো কম দিন নয়, একটু পূণ্যি করলে ক্ষতি নেই । সবুরে মেওয়া ফলবে, আসল উদ্দেশ্যের সমাধান ঠিকই হবে । অনেক ঘুরে পার্থ মণিপুরে এল । মণিপুরে এসে তার চোখ জুড়িয়ে গেল । কি সুন্দর পাহাড়ী জায়গা! চারদিক সবুজে ঘেরা, শান্তিপূর্ণ দেশ । মণিপুরের রাজা চিত্রবাহনের সাথে পরিচয় হওয়ায় পর পার্থ জানতে পারলো মহাদেবের বরে এই রাজ পরিবারের প্রতি পুরুষের একটি মাত্র সন্তান হবে । চিত্রবাহনের দাদাদের ছেলে হ'য়েছিল, কিন্তু চিত্রবাহনের একমাত্র মেয়ে চিত্রাঙ্গদা । সে মেয়ে হ'লেও তাকে ছেলের মতো মানুষ করা হ'য়েছে । শৌর্য বীর্যে সে পুরুষের মতো । রাজা পার্থকে বললেন যদি

তোমার পছন্দ হয়, তুমি আমার মেয়েকে বিয়ে করতে পার । কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে, তোমাদের সন্তান আমার বংশধর হ'য়ে আমার রাজ্য রক্ষা ক'রবে ।' পার্থ ভাবলো 'মেয়েকে ছেলের মতো মানুষ ক'রে কি মাল তৈরী ক'রেছে কে জানে? এখন রাজাকে কোনও মতামত দিয়ে লাভ নেই, সুন্দরী হ'লে ভেবে দেখা যেতে পারে । রাজকণ্যার সঙ্গলাভ করা যাবে অথচ সন্তান হ'লে কোনও দায়িত্ব থাকবেনা, এ তো পুরুষ জাতির স্বপ্ন! এই রাজকণ্যাকে একবার দেখতে হ'চ্ছে ।'

একদিন পথে পুরুষবেশী চিত্রাঙ্গদাকে দেখে পার্থ বিশেষ পাত্তা দিলোনা । 'দূর, এই ছেলে মার্কা মেয়েকে আবার কে বিয়ে করবে?' এদিকে পার্থর রূপ দেখে চিত্রাঙ্গদাতো একদম কুপোকাৎ। শিকার টিকার করা মাথায় উঠলো, নাওয়া খাওয়ায় আর মন রইলোনা । অনেক চিন্তা ভাবনা ক'রে সখীদের অনুরোধে সেজেগুজে নারী বেশে একদিন চিত্রাঙ্গদা পার্থর সাথে দেখা ক'রলো । নারী রূপী সালংকারা চিত্রাঙ্গদাকে দেখে পার্থর মন পাল্টাতে সময় লাগলোনা । চিত্রবাহনের চুক্তিটাতো মাথায় ঘুরছিল, তাই প্রতিজ্ঞা করে বিয়েটা তাড়াতাড়ি সেরে নিল । মণিপুরে হেসে খেলে তিন বছর যে কোথা দিয়ে কেটে গেল বুঝতেই পারলো না । সেখানে চিত্রাঙ্গদার কোলে তার ছেলে বভ্রুবাহনের জন্ম হ'লো ।

মণিপুরে থাকা কালে পার্থর কানে এলো অগস্ত্য, সৌভদ্র, পৌলম, কারন্ধম ও ভারদ্বাজ নামে পাঁচটি তীর্থ স্থান কুমীরের ভয়ে তপস্বীরা বর্জ্জন করছেন । এই কুমীরেরা নাকি মানুষ টেনে নেয় । পার্থ উলুপীর কাছে বর পেয়েছিল জলেও সে জয়ী হবে তাই নির্ভয়ে কারো বারণ না শুনে সৌভদ্র তীর্থে স্নান করতে নামল । কুমীর যখন তার পা টেনে ধরলো, পার্থ তাকে সবলে উপরে তুলে নিয়ে এলে কুমীর এক সুন্দরী নারীতে পরিবর্ত্তিত হ'য়ে গেল । সে তার পরিচয় দিয়ে বল্লো 'আমি অপ্সরা বর্গা, কুবেরের প্রিয়া। আমি ও আমার চার সখী এক ব্রাহ্মণকে প্রলুব্ধ করতে গিয়ে তাঁর শাপে কুমীর হ'য়ে গিয়েছিলাম । আমরা অনেক কান্নাকাটি করার পর তিনি বলেছিলেন 'এক পুরুষ শ্রেষ্ঠ তোমাদের শাপ মুক্ত করবেন ।' বর্গার অনুরোধে পার্থ বাকী চার অপ্সরাকেও সাপমুক্ত করল । চার অপ্সরাকে পেয়ে পার্থতো মহা খুশী । ভাগ্যিস উলুপী বর দিয়েছিল! তা'নাহলে এই পাঁচ সুন্দরীর সঙ্গ পাওয়া সম্ভব হ'তোনা । এরা তো অপ্সরা, নৃত্য গীতে ডুবে থাকাইতো এদের কাজ! এদের বিবাহ পাশে বন্দী হওয়ারও কোন আকর্ষণ নেই । আহা বনবাসে এসে যে এত আনন্দ হবে তা পার্থ স্বপ্নেও ভাবেনি । কিছুদিন মনের সুখে আনন্দ করার পর পার্থ মণিপুরে ফিরে শ্বশুরমশাইকে বভ্রুবাহন ও চিত্রাঙ্গদার ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হ'লো । এবার যাবার পালা । চিত্রাঙ্গদাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লো 'আমার বিরহে দুঃখ ক'রোনা । তুমি আমার মনের মধ্যে চিরকাল থাকবে । দাদা যখন রাজসূয় যজ্ঞ করবে তখন বরঞ্চ তোমার বাবার সাথে ইন্দ্রপ্রস্থে একবার এসো । তখন আমার সব আত্মীয় স্বজনদের সাথে তোমাদের পরিচয় করিয়ে দেব । চিত্রাঙ্গদাকে পার্থ বাসি কাপড়ের মতো মণিপুরে রেখে বিদায় নিল ।

মণিপুর থেকে পার্থ পশ্চিম সমুদ্রের ধারে সব তীর্থস্থান দর্শন করতে গেল । খবর পেয়ে চিরসখা কৃষ্ণ এসে পার্থকে বল্লেন 'অনেকদিন তো তীর্থ করলে, এবার আমার সঙ্গে রৈবত পাহাড়ে চল । দারুণ জায়গা, তোমার জন্য অনেক খাওয়া দাওয়া ও গান বাজনার আয়োজন করে রেখেছি ।' এতদিন পর বন্ধুকে দেখে পার্থর মন আনন্দে ভরে উঠলো । রৈবত পাহাড়ে বিশ্রাম নিয়ে স্বর্ণময় রথে চড়ে কৃষ্ণের সঙ্গে পার্থ দ্বারকায় যাত্রা করল । খবর পেয়ে শত সহস্র নারীপুরুষ তাকে দেখবার জন্য রাজপথে এসে উপস্থিত । কিছুদিন পর রৈবত পাহাড়ে যাদবদের মহোৎসব সুরু হওয়াতে প্রচুর নারী পুরুষের সমাবেশে উৎসব মুখরিত হ'য়ে উঠলো । যাদবরা যে 'পার্‌টি এনিমেল' তা' সর্ব্বজনবিদিত । বাসুদেবের সাথে পার্থ নানা রকম কৌতুক দেখে বেড়াতে লাগল ।

একদিন উদ্দেশ্যহীন ভাবে কৃষ্ণর সাথে বেড়াতে বেরিয়ে পার্থ বাসুদেব কন্যা সুভদ্রাকে দেখে আকৃষ্ট হ'য়ে চোখ সরাতে পারছিলনা । কৃষ্ণ তা' লক্ষ্য করে বল্লেন 'কি ব্যাপার, তুমি না বনবাসী, আমার বোনকে দেখে তোমার মন কামে আলোড়িত হ'লো কেন? যদি সত্যি একে পেতে চাও, আমি বাবাকে ব'লে দেখতে পারি । ক্ষত্রিয়ের পক্ষে তো স্বয়ংবর প্রথা প্রচলিত । আমার কিন্তু ভাই নারী চরিত্রে বিশ্বাস নেই, যদি সুভদ্রা স্বয়ংবরে অন্য কারোকে বরণ করে তা' হ'লে তো তোমার বাসনা পূর্ণ হবেনা ।' উদগ্রীব হ'য়ে পার্থ বল্লো 'তা' হ'লে কি করা যায় বলো তো? সুভদ্রাকে আমার চাই ।' কৃষ্ণ মুচকি হেসে বল্লেন 'সে আর বলতে? আমি তোমার চাহনি দেখেই বুঝতে পারছি । তুমি আমার

বোনকে সবলে হরণ ক'রতে পার। ক্ষত্রিয় বীরের পক্ষে এ বিধি সম্মত।' কৃষ্ণের উপদেশে পার্থর মন আনন্দে নেচে উঠলো সে ভাবতেই পারেনি কৃষ্ণ এমন একটা দুঃসাহসিক উপদেশ দেবেন। সঙ্গে সঙ্গে পার্থ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে কাঞ্চনরথে চড়ে রৈবত পাহাড়ের দিকে রওনা দিল।

বেচারী সুভদ্রা পুজো শেষ করে রৈবত পাহাড় প্রদক্ষিণ করে দ্বারকায় ফিরছিল, পার্থ তাকে সবলে রথে তুলে নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থের দিকে রওনা দিল। এই ঘটনা দেখে কিছু সৈনিক কোলাহল করতে করতে মহাভেরী বাজাতে লাগলো। যাদবেরা পান ভোজন ছেড়ে মন্ত্রণা সভায় জমায়েত হ'য়ে যুদ্ধের জন্য উদগ্রীব হ'য়ে উঠল। কৃষ্ণকে চুপ করে থাকতে দেখে মদ্যপান রত বলরাম বল্লেন 'তোমার জন্যই পার্থকে আমরা সমাদরে অভ্যর্থনা ক'রে থাকতে দিয়েছিলাম। কিন্তু সে আমাদের অন্ন গ্রহণ করে ভোজন পাত্র ভেঙে দিয়ে চলে গেল? এই কুলাঙ্গার আমাদের সুভদ্রার যোগ্য নয়। আমি কুরুকুল ধ্বংস করে এর বদলা নেব।' কৃষ্ণ বল্লেন 'তোমরা কিন্তু মাতাল হ'য়ে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলছ। একবার ভাল করে ভেবে দেখ পার্থ যা করেছে তাতে সত্যি আমাদের যদুবংশের অপমান হ'য়েছে কিনা। পার্থ উচ্চবংশজাত, রূপে গুণে অদ্বিতীয়, যুদ্ধে অজেয়। এমন পাত্র কে না চায়! এখন ভেবে দেখ বেকুবের মতো যুদ্ধ ঘোষণা করবে না মিষ্টি কথায় তাকে ফিরিয়ে আনবে। এমন বর পেয়ে সুভদ্রাও এতক্ষণে গলে গেছে মনে হয়। ওদিক থেকেও তোমাদের বিশেষ সুবিধে হবেনা।' যাদবেরা কৃষ্ণের উপদেশে পার্থকে ফিরিয়ে আনলেন। মহা ধুমধাম করে সুভদ্রার সাথে তার বিয়ে হ'লো। বিয়ের পর এক বৎসর দ্বারকায় থেকে বনবাসের অবশিষ্ট সময় পুষ্কর তীর্থে কাটিয়ে সুভদ্রাকে নিয়ে পার্থ ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরে এল।

ইন্দ্রপ্রস্থে বহুদিন পর কৃষ্ণাকে দেখে পার্থর মন চঞ্চল হ'য়ে উঠলো। সে বারবার কৃষ্ণার কাছে ক্ষমা চাইতে লাগলো। তেজস্বিনী কৃষ্ণা পার্থকে বল্লো 'তুমি সুভদ্রার কাছেই যাও, তোমার সাথে আমার বন্ধন শিথিল হ'য়ে গিয়েছে।' কিন্তু পার্থ সে কথা মানবে কেন? এতদিন বাদে তার প্রথম প্রেমের সাথে দেখা হ'য়েছে, মনের বাসনা, কামনা দমন করা তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠেছে। কৃষ্ণাকে নিজের করে পাওয়ার জন্য তার শরীরের সমস্ত শিরা উপশিরা জেগে উঠেছে। পার্থ বুঝতে পেরেছিল কোমল স্বভাবের নবযৌবনা নিরীহ সুভদ্রা কৃষ্ণার ব্যক্তিত্বকে ভয় পেলেও মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকে দেখছে। কৃষ্ণার বন্ধুত্ব পাবার আশায় সে উদগ্রীব। সুযোগ বুঝে পার্থ সুভদ্রাকে আড়ালে ডেকে বল্লো 'গোপিবধুর বেশে তুমি মায়ের কাছে যাও, মা তোমাকে দেখে খুব খুশী হবেন। সেই সঙ্গে কৃষ্ণার সঙ্গেও আলাপ করে এসো, দরকার হলে একটু গ্যাস দিতেও দ্বিধা করোনা।' পার্থের কথায় সুভদ্রা গোপিবধুর বেশে কুন্তীকে প্রণাম করলে কুন্তী পরম স্নেহে তাকে আশীর্ব্বাদ করলেন। সুভদ্রা কৃষ্ণার প্রিয় পাত্রী হওয়ার আশায় তাকে প্রণাম করে বল্লো 'দিদি আমি তোমার দাসী।' কৃষ্ণা খুশী হ'য়ে তাকে আলিঙ্গন করে আশীর্ব্বাদ করল 'তোমার স্বামীর যেন কোনও শত্রু না থাকে।'

পার্থ সব জানার পরে ভাবল 'পুরুষের রূপ গুণ থাকলে মেয়েদের বশ করাটা কোন সমস্যাই নয়।' যে আশা নিয়ে পার্থ বনবাসে গিয়েছিল, তা ষোলকলায় পূর্ণ হ'য়েছে। জীবনে যত দুঃখই আসুক, বার বছরের বনবাসের স্মৃতি তার মনে চিরকাল সুখ এনে দেবে, এই ভেবে পার্থ বন্ধু কৃষ্ণের সাথে মনের আনন্দে মৃগয়া করতে বেরোল।

তথ্য সংগ্রহ: কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস কৃত মহাভারত সারানুবাদ — রাজশেখর বসু

দাদার বাঘ শিকার

মেখলা বন্দ্যোপাধ্যায়

আমার জ্যেঠামশাই-এর (সচীবাবু) শিকারের শখ ছিল — পাখী, বুনোহাঁস থেকে শুরু করে বাঘ, কুমীর পর্য্যন্ত। আমরা লেখাপড়া শেষ করে তাঁকে ঘিরে বসতাম গল্প শোনার জন্য যতক্ষণ না মা খেতে ডাক্‌ত। উনি প্রথম জীবনে বাঁকুড়ায় থাকতেন, ওখানের কলেজে পড়াতেন।

''আমার শিকারের গল্প বন্ধুমহলেও সবাই জানতেন। তাসের আড্ডার সাথে সাথে উত্তেজক শিকারের গল্প সবাইকে আটকে রাখত আনেক রাত পর্য্যন্ত। আড্ডার সভ্যদের কোন বিশেষ গন্ডী ছিলনা। শিক্ষক, ডাক্তার, সরকারি কর্মচারী, বয়সও অনেকটাই ছড়ানো। বিরেনবাবু ইংরেজী পড়ান, বয়স চল্লিশের মাঝামাঝি। মাঝারি উচ্চতা, মোটাসোটা চেহারা, অল্প টাক, চুল কালো, নাকের নীচে মোটা গোঁফ। প্রতিবারই শিকারের গল্প তাঁকে এতই উত্তেজিত করে তুলত যে পরের বারে শিকারে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাকে অনুরোধ করা শুরু হয়ে যেত। অনেক কষ্টে নানা অজুহাত খাটিয়ে তাঁকে বিরত করতে হোত। বাঁকুড়ার কাছে ছিল ছোট পাহাড়ের শ্রেণী, নাম শুশনে পাহাড়, তাকে ঘিরে ঘন জঙ্গল, নানা জন্তু জানোয়ারের বাসস্থান। বাঘ বুড়ো হলে বা জখম হলে গ্রামে নেমে আসে। গরু, ছাগল বা মানুষ অতি সহজেই সে করায়ত্ত করতে পারে। বনের পশু ধরতে অনেক পরিশ্রম লাগে। বাঘের উপদ্রব শুরু হলেই আমার কাছে খবর আসে। আমিও দেরী না করে সঙ্গে সঙ্গে দিন ঠিক করে ফেলি। দেরী করা মানেই আরও প্রাণক্ষয়, বাঘ তো আর উপোস থাকবেনা। একদিন কলেজ থেকে ফিরে এসে দেখি হরেন দরজার সামনে বসে। আমাকে দেখেই উঠে দাঁড়াল, 'কি গো হরেন, খবর আছে মনে হচ্ছে, এসো ভেতরে এসো।' 'ওরে ভোলা, আমাদের চা-মুড়ি দিয়ে যা, হরেন এসেচে।' আমি ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসলাম, হরেন মাটিতে। একটু পরেই জল খাবার এসে গেল। খেতে খেতে সব খবরাখবর নিয়ে নিলাম। 'এই সামনের পূর্ণিমার দিনই যাব, বেশী দেরী করা ঠিক হবেনা। হ্যাঁ মাচা লাগবে, প্রতিবারই যেমন কর, আর সবাইকে সাবধান করে দিও সন্ধ্যের পর কেউ যেন কোথাও না যায় আর দিনের বেলাও নদীতে চান করতে যেন দলবেঁধে যাতায়াত করে।'

'পেন্নাম হই গো, এখন তবে আসি' বলে হরেন বিদায় নেয়।

পরদিন কলেজে খবর জানাজানি হতেই বিরেনবাবু একেবারে জাপটে ধরলেন আমাকে। 'এবার আমাকে নিয়ে যেতেই হবে কোন অজুহাত আমি শুনছিনা।' বিপদে পড়লেও শেষ পর্য্যন্ত রাজী হতেই হল। নির্দ্দিষ্ট দিনে দুপুরে রুটি তরকারি খেয়ে তৈরী হয়ে নিলাম। রাতে জাগতে হলে ভাতটা বর্জন করাই ভাল। খাকি জামা প্যান্ট, কোমরের বেল্টে গুটি কতক কার্টিজ, এক কাঁধে বন্দুক অন্য কাঁধে জলের বোতল, পায়ে কেড্‌স জুতো। আওয়াজ হয়না, গাছে চড়তেও সুবিধে। রিক্সাকে বলাই থাকত, 'আমি এসে গ্যাছি।'

'চল আজ চার্চপাড়ায় যেতে হবে এক বাবুকে তুলতে।'

আমি সাধারণত ভাড়া গাড়ীতেই গ্রাম পর্য্যন্ত যাই, এবার বিরেনবাবু তাঁর গাড়ীতেই যাওয়ার জন্য জোরাজোরি করলেন। বাড়ীর সামনেই গাড়ীটা দাঁড়িয়ে ছিল। রিক্সা থেকে নেমে বললাম, 'ওরে জগা, ভেতরে গিয়ে বলে আয়, আমি এসে গেছি।' জগা দরজা ঠেলে বাড়ীতে ঢুকে বলে এল। আমি পায়চারী করছি আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখছি। জগা আমার বহু বছরের সঙ্গী, আমাকে সে চেনে ভাল করেই।

'আর একবার বলে আসি বাবু?' 'হ্যাঁ তাই যা,' আমি বেশ বিরক্ত। ফিরে এসে জগা রিক্সা নিয়ে চলে গেল। আমার ধৈর্য্যের বাঁধ যখন ছিঁড়ব ছিঁড়ব করছে, বিরেনবাবু বেরিয়ে এলেন। 'আর বলেন কেন, আপনার বৌমার জন্য একটু দেরী হয়ে গেল।' 'প্রায় চল্লিশ মিনিট' না বলে পারলাম না। গাড়ীতে উঠে পেছনের সীটে বসলাম, পাশে বিরেনবাবু।

'পরেশ, খাবারটা গাড়ীর পেছনে রেখে দাও তো, এখানে জায়গা হবেনা।' জানলা দিয়ে দেখি, বাড়ীর চাকরই হবে,

দুহাতে দুটি বড় আকারের টিফিন ক্যারিয়ার, কাঁধে একটি মোটা ব্যাগ। আমি বললাম, 'পরেশ, গাড়ী ষ্টার্ট দাও, হরেন অপেক্ষা করবে আমাদের জন্য।' পরেশ ষ্টার্ট দিতেই বিরেনবাবু কাঁদকাঁদ হয়ে বললেন, 'আরে দাঁড়াও, খাবারগুলো উঠুক, বুদ্ধুটা করছেটা কি, দাঁড়িয়ে আছে কেন?' আমি আর থাকতে পারলামনা। 'পরেশ' বলে ডাকতেই সে গাড়ী ছেড়ে দিল। এরপর ওর মনিবের দিকে ফিরে বললাম, 'আমরা কি পিকনিক করতে যাচ্ছি নাকি?' 'আরে দাদা, খেতে তো হবে, তাই রমা লুচি, আলুরদম আর কিছু সন্দেশ দিয়ে দিল। আমার আবার রাতে ডিনারটা একটু ভাল করে না খেলে ঘুমই আসেনা।' 'ওঃ বড্ড ভুল হয়ে গেছে, আগে বলা হয়নি, আজ রাতে তো হরিমটর।' মনে মনে বললাম 'আগে বললে উনি হয়ত আর ঘাড়ে চাপতেননা।' এতক্ষণে নজরে এল ওঁর শিকারের পোশাক, খাকি হাফ প্যান্ট, রঙিন বুশ সার্ট, পায়ে হাঁটু পর্য্যন্ত চামড়ার বুট, কোমরে দামী বেল্ট তাতে ভর্তি কার্টিজ, মাথায় বিরাট এক টুপি, হাতে ধরে আছেন বহু পুরনো একনলা বন্দুক।

'এটি আমার ঠাকুর্দার বন্দুক' বুঝতে দেরী হলনা একটি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে, পরের গুলিটি ছোঁড়ার আর সময় পাওয়া যাবেনা, তার আগেই বাঘের শিকার হতে হবে। মনে মনে ভাবলাম, মানুষখেকো বাঘ ছেলে খেলার জিনিস নয়, আজ কপালে কি আছে কে জানে। না বলে পারলামনা, 'চেহারাটা বাদ দিলে একেবারে হুবহু মিলে গেছে বিখ্যাত শিকারী জিম করবেটের সঙ্গে।' উনিও তুলনাটি বেশ খুশী মনেই নিলেন।

'আমার হচ্ছে কিনা যেখানে যেরকম সেখানে ঠিক সেরকম পোশাকই পরা উচিত কি বলেন দাদা?'

'সে তো ঠিকই।'

ঘন্টাখানেক রাস্তা, বিরেনবাবুর শিশুসুলভ প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নিজের উপরই রাগ হচ্ছিল, ওঁকে নিয়ে আসার জন্য। এবার থামতে বললাম পরেশকে, হরেন অপেক্ষা করছিল বাসস্টপে চায়ের দোকানে প্রতিবারের মতই। উঠে বসল সামনের সীটে, ওই এখান থেকে রাস্তা চিনিয়ে নিয়ে যাবে। সন্ধ্যে হতে একটু দেরী আছে, তার আগেই মাচায় পৌঁছতে হবে। আরও একঘন্টা মত চলে গাড়ী থামল। দূর খুব বেশী নয় তবে কাঁচা রাস্তা। কালীপদ, ভীম ও আরও কিছু গ্রামের লোক আমাদের জন্য দাঁড়িয়ে ছিল। একজনের হাতে একটি ছাগলছানা। আমাকে দেখেই 'পেন্নাম হই বাবু' বলে কালী আর ভীম এগিয়ে এল। 'সব ঠিক আছে তো?' বলি আমি। 'হ্যাঁ গো বাবু, তবে বাঘটা প্রেতিরাতেই গেরামে ঢুকেছে, আমরা আপনার কথামত চলাতে ছাগল আর বাছুরই নিতে পেরেছে।' 'চল, আর দেরী নয়, রোদ ডুবে গেছে, অন্ধকার হওয়ার আগেই মাচায় উঠে পড়তে হবে। এবার এক নতুন বাবু সঙ্গে আছেন।'

সবাই মিলে পা চালিয়ে হাজির হলাম গাছের তলায়, আমি তো উঠে গেলাম, এবার এক হাসির নক্সা বিরেনবাবুকে গাছে তোলা নিয়ে। বুট পিছলে যাচ্ছে, শেষে বুট খুলে খালি পায়ে দুজন লোক ঠেলে দিল, আমি উপর থেকে টেনে নিলাম। ছাগলটি গাছে বেঁধে রেখে ওরা চলে গেল। আমি ওনাকে যা যা বলার বলে বন্দুক হাতে ধরিয়ে নিজেও তৈরী থাকলাম। আস্তে আস্তে অন্ধকার গাড় হতে লাগল। হঠাৎ চটাস্ চটাস্ শব্দ, 'উঃ, কি মশা রে বাবা!' আমি রাগে খপ করে ওর হাতটা চেপে ধরলাম। মুখে হাত চাপা দিয়ে বোঝাতে চাইলাম কোন কথা বা শব্দ নয়। আমার নিজের ওপরই রাগ হল ওঁকে আনার জন্য। আরও কতক্ষণ কাটল জানিনা, হঠাৎ দূরে ফেউয়ের ডাক শোনা গেল। ফেউ হল শেয়ালের মত তবে ওর চেয়ে ছোট একটা জন্তু। বাঘ বেরোলেই ওরা অন্য জন্তুদের সাবধান করে দেওয়ার জন্য ডেকে ডেকে ঘুরে বেড়ায়। ওদের বাঘের শত্রু বলা যায়। আমি একেবারে তঠস্থ হয়ে ঝোপঝাড় লক্ষ্য করতে লাগলাম, মনে হল দূরে দুটো আলো দেখতে পেলাম একটা ঝোপের মধ্যে। আমি সোজা হয়ে বসলাম, বন্দুকের ট্রিগারে আঙুল রেখে। আলোটা এই ঝোপ ঐ ঝোপ করতে করতে এগোতে লাগল। আমি কনুই দিয়ে বিরেনবাবুকে ঠেলা দিলাম। ওঁকে আমি প্রথম গুলি ছোঁড়ার সম্মানটা দিতে চাই। উনি একেবারে চুপ, কোন সাড় নেই। আমারও আর অপেক্ষা করার সময় নেই। ছাগলছানাটা ব্যা ব্যা করছে, বাঘের গন্ধ পেয়েছে, আর জ্বলজ্বলে আলোদুটোও বেশ কাছের ঝোপে এসে থামল। এখুনি বাঘ লাফ দিয়ে ছাগলটাকে নিয়ে পালিয়ে যাবে চোখের পলক পড়ার আগেই। আমি আবার ওঁকে ধাক্কা দিলাম। 'মাসীগো আমরা এখানে,' বলে উনি ককিয়ে উঠলেন। বন্দুকটা হাত থেকে মাটিতে পড়ে আপনা আপনি গুলি ছুটে গ্যালো, ভাগ্যি ভালো আমাদের গায়ে লাগেনি। চক্ষের নিমেষে বাঘ মাচা লক্ষ্য করে লাফ দিল, আমি গুলি ছুঁড়লাম, বাঘ মাটিতে পড়ল ধড়াস্ করে। আরও কটা গুলি মেরে নিশ্চিন্ত হলাম।

পাশে ঠেলা দিয়ে দেখি বিরেনবাবুর জ্ঞান নেই । বোতল থেকে জল নিয়ে চোখেমুখে ছিটিয়ে ওঁর জ্ঞান ফেরানোর চেষ্টা করতে লাগলাম । খানিক পরে ঢাকঢোলের আওয়াজে জানান্ দিল হরেনরা আসছে । ওরা গুলির শব্দ শোনার পর আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে, হৈ হৈ করে মশাল জ্বালিয়ে এসে পড়ল । বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে দেখল বাঘ সত্যিই নিস্তব্ধ কিনা । আমি ততক্ষণে নেমে পড়ে হরেনকে বললাম বিরেনবাবুকে নামাতে । ওঁর জ্ঞান ফিরছে একটু একটু করে । দুতিনজন মিলে ধরাধরি করে ওঁকে নামাল । ভয়েতে প্যান্টেই যা হবার হয়ে গেছে । সে এক লজ্জাস্কর পরিস্থিতি। উনি এত লোকের মাঝে ভরসা পেয়ে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠলেন । একটু শান্ত হলে ঝোপের আড়ালে গিয়ে নোংরা প্যান্ট ছেড়ে ভীমের পাগড়ীটা নিয়ে লুঙ্গি পরে বেরিয়ে এলেন । হাঁটু অবধি বুট, দৃশ্যটি গিনিস বুক অফ রেকর্ডে দেওয়ার মত । গ্রামের লোকেরা প্রচন্ড ভারী বাঘের দেহটা বাঁশে বেঁধে চারজনে মিলে ঝুলিয়ে গান গাইতে গাইতে নিয়ে চলল । আমরা হেঁটে গিয়ে গাড়ীতে উঠলাম । বিরেনবাবুর প্রথম কথা, 'খাবারটা গাড়ীতে থাকলে এখন খেতে পারতাম ।' অনেক কষ্টে হাসি চেপে বললাম, 'একটু বাদেই বাড়ী পৌঁছবেন, চান টান করে আরাম করে বসে বাঘ শিকারের রোমাঞ্চকর গল্প বলতে বলতে খেতে বেশী ভাল লাগবে ।' অন্য সঙ্গী কাউকে নিয়ে শিকারে যাওয়া আমার সেই প্রথম আর সেই শেষ । অবশ্যই বাঘ শিকার, পাখী টাখী ঠিক আছে ।''

ভাঙল ঝড়ে

মনীষা বসু

ঘুম ভাঙ্গার পর সামনের খালি দেওয়ালের দিকে চোখ পড়তেই বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে উঠলো তোর্ষার । মনে পড়ল গতকাল রাত্রে বাড়ি ফেরার পর ঘরে ঢুকে দেওয়ালে নীলেশের ছবি দেখতে না পেয়ে মা'র কাছে ছুটে গিয়েছিল । মা ঠিক বুঝতে পেরেছিল । কিছু না বলে ওকে বুকে টেনে নিয়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলেছিল আগামী কাল তোদের বিয়ে । রাত্রে সোম থাকবে । তোর ঘরে নীলেশের ছবি থাকলে কি ওর ভালো লাগবে, বল? তাই আমি নীলেশের ছবি ঠাকুর ঘরে রেখেছি । গত দু-বছর ঘুম ভাঙ্গার পর চোখ খুলে প্রথমেই নীলেশের হাসি মুখ দেখতে অভ্যস্ত তোর্ষার শুন্য দেওয়াল দেখে চোখে জল এসে গেল । মনে হলো আজ হতে নীলেশ সত্যি সত্যি ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাবে । সোমের সাথে আজ ওর বিয়ে । জাঁক জমকের বিয়ে না । ওরা যাস্ট রেজেস্ট্রী করবে । ও আর কনে সেজে টোপর পরে বিয়ে করতে চায়নি । সোম খুব আন্ডারস্টেন্ডিং । ওর ইচ্ছেটাই মেনে নিয়েছে । সত্যি বলতে তোর্ষা বিয়ে করতেই চায়নি । সোম একরকম জোর করেই ওকে রাজী করিয়েছে । তাছাড়া বাবা, মা'র বয়েস হয়েছে । ওদের সব সময় দুশ্চিন্তা ওকে নিয়ে । মা'র চোখের জল ও আর সহ্য করা যাচ্ছিল না । কত যুদ্ধ করবে সবার সাথে, নিজের সাথে তোর্ষা । বন্ধু বান্ধবরাও বলে যে চলে গেছে সে তো আর ফিরে আসবে না তাহলে কেন সারাটা জীবন ও একা একা কাটাবে । তাছাড়া আত্মা বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সোমকে বিয়ে করলে নীলেশের আত্মাও শান্তি পাবে । নিজেও বুঝতে পারে মাত্র পঁচিশ বছর বয়েস, সামনে সুদীর্ঘ জীবন একা কাটানো খুব সহজ না । কিন্তু এসব কি বিয়ের কারণ হতে পারে, না হওয়া উচিত? সোমের প্রতি কি অবিচার করা হচ্ছেনা? ওর না হয় দ্বিতীয় বিয়ে কিন্তু সোমের তো প্রথম । ওর তো অনেক ঘটা করে সামাজিক বিয়ে হওয়ার কথা । তাছাড়া ওর বাবা আর বিশেষ করে মায়ের নিশ্চয় নানা রকম কল্পনা ছিল একমাত্র ছেলের বিয়ে নিয়ে । ওনারা নিশ্চয়ই তোর্ষার ওপর বিরক্ত । সোমকে অনেক বুঝিয়েছে কিন্তু সোম নাছোড়বান্দা । কোন কথাই শুনতে চায়নি । ওর কেবল এক কথা এসব তোর্ষার কল্পনা। ও তো মাকে বলেই দিয়ে ছিল বিয়ে করবে না । তাই তোর্ষাকে বিয়ে করবে শোনার পর হতে বাবা মা খুব খুশী । মা তো নতুন করে বাড়ি সাজাচ্ছে । তোর্ষার জন্য কতো শপিং করছে । সেটা অবশ্য ঠিক । বিয়ের পর ও আর নীলেশ যখন সোমের বাবা মাকে প্রণাম করতে গিয়েছিল তখন ওর মা সুমিতামামি দুঃখ করে বলেছিলেন কত ভালো ভালো সম্বন্ধ আসছে । কিন্তু সোমকে বিয়েতে কিছুতেই রাজী করানো যাচ্ছেনা । কিন্তু সোম আগে কেনই বা বিয়ে করতে চায়নি আর এখনই বা তোর্ষাকে বিয়ে করার জন্য এত ব্যস্ত কেন সেটা এখনো ওর কাছে ধাঁধা । অনেক বার জানতে চেয়েছে তোর্ষা । কিন্তু কিছু না বলে সোম কেবল হাসে আর বলে, সব কথা জানতে নেই । অনেক সময় ওর মনে হয় তাহলে সোম কি আগে থেকেই ওকে ভালোবাসতো? কিন্তু কখনো তো কিছু বলেনি বা কোনদিন কিছু বুঝতেও দেয়নি । ছোট থেকেই ওরা খুব ভালো বন্ধু । মনের সব কথাই ওরা শেয়ার করতো । নীলেশের সাথে যখন জোর প্রেম চলছে তখন ওতো সব জানতো । মাঝে মাঝে সন্দেহ হয় সোম ওকে করুণা করছে না তো?

পাশের টেবিল থেকে ফোন নিয়ে দেখল মোটে ভোর পাঁচটা । মেসেজ এসেছে দেখে খুলে দেখল সোম পাঠিয়েছে কিছুক্ষণ আগে । লিখেছে 'টু এক্সাইটেড — ঘুম আসছেনা' । হেসে ফোন রেখে পাশ ফিরে শুয়ে পড়ল । সোম যা পাগল একবার রিপ্লাই দিলে আর রক্ষে নেই । ঘুমের বারোটা বেজে যাবে । সোমের স্বভাবের এই দিকটা ওর জানা ছিলনা । ও যে এত রোমান্টিক আগে কখনো বোঝা যায়নি । ছোট থেকেই জানে খুব চাপা স্বভাবের ছেলে সোম । সেই কবে থেকে ওকে চেনে । বাবা সেন্ট্রাল গর্ভমেন্টে কাজ করতেন । দু-তিন বছর পর পর বদলীর অর্ডার আসতো । উঁচু ক্লাসে ওঠার পর পড়াশুনোর ক্ষতি হবে বলে দাদা তমাল আর ও মামাবাড়ি থাকত । সোমদের বাড়ি ছিল মামাবাড়ির পাশেই । মামিমা আর সোমের মা ছিলেন খুব বন্ধু । দুই বাড়িতে সব সময় যাওয়া আসা ছিল ।

ভালো কিছু রান্না হলেই এ ওর বাড়িতে পাঠাত। সোম আর দাদা এক ক্লাসে পড়ত। ওরা একসাথে কতো লুডু, ক্যারাম, তাস খেলেছে। ছোট থেকেই সোমের খুব ঠান্ডা স্বভাব। অনেক সময় রাগ করে দাদা ওকে আর মামাতো বোন রুনুকে খেলায় নিতে না চাইলে সোম জোর করে ওদের খেলতে নিত। সোমই নীলেশের সাথে ওর আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। ওরা দুজনে খড়গপুর আই আইটিতে এক সাথে পড়ত। নীলেশ ছিল প্রবাসী বাঙালী এলাহাবাদে মানুষ। প্রথম প্রথম কথায় খুব টান ছিল। একবার দূর্গাপূজোর সময় নীলেশ এসেছিল সোমের সাথে। তোর্ষা তখন হিষ্ট্রী অনার্স নিয়ে প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে। 'লাভ এট ফার্স্ট সাইট' কথাটা নীলেশ আর তোর্ষার জন্য একেবার সত্যি। এখনো পরিস্কার মনে আছে ওদের প্রথম দেখা হওয়ার দিনটা। সবে সন্ধ্যা হয়েছে। ও, রুনু আর বন্ধুরা মিলে পাড়ার প্যান্ডেলে আরতি দেখেছে। পরে ঠাকুর দেখতে যাবে। সোমের সাথে নীলেশও প্যান্ডেলে ছিল। সোম ওদের সাথে নীলেশের আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। সোমের কাছে আগেই শুনেছিল ওর এক প্রবাসী বন্ধু এসেছে কলকাতার পুজো দেখবে বলে। প্রথমেই নীলেশের সবজে রং-এর কটা চোখ ওকে ভীষণ আকর্ষণ করেছিল। কতো রাত পর্যন্ত সেদিন যে ওরা প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরেছে আর কত যে ফুচকা, আলু কাবলী, অমলেট, কফি খেয়েছ তার কোন হিসেব ছিল না। বুঝতে পারছিল নীলেশ ওকে একটু বেশী অ্যাটেন্‌শান দিচ্ছে। আর সেটা বেশ ভালোই লাগছিল তোর্ষার। রুনু, জবা আর সৃষ্টিও বুঝতে পেরে মাঝে মাঝে ওকে ক্ষেপাচ্ছিল। রাত্রে বাড়িতে ঢোকার আগে নীলেশ ওর সেই আশ্চর্য চোখ ওর চোখে রেখে বলেছিল, কলকাতায় পুজো দেখার যে এত আনন্দ আগে ভাবতেই পারেনি। হেসে বলেছিল তোর্ষা, কাল আবার আসবেন। বাড়িতে ঢুকে রুনু বলেছিল, পারিসও বাবা। মনে আছে সেদিন সারা রাত প্রায় জেগেই ছিল। অজানা এক ভালোলাগায় মন ছিল ভরে।

সেবার পুজোয় খুব আনন্দ হয়েছিল। রোজ বিকেলে ঠাকুর দেখতে বের হতো সবাই মিলে। তার মধ্যেই ও আর নীলেশ একটু আলাদা হয়ে গল্প করতো। বিজয়ার দিন সবার আড়ালে নীলেশ ওকে টকটকে লাল রঙের একটা গোলাপ দিয়ে বলেছিল, আগামীকাল রাত্রে আমি এলাহাবাদ যাবো। সকালে কি একবার তোমার সাথে কোথাও একা দেখা করতে পারি? ও তো তখন কলকাতার কিছুই চিনত না তাই সকাল দশটা নাগাদ ওকে সোমদের বাড়ির সামনের বাসস্টপে দাঁড়াতে বলেছিল তোর্ষা। সেদিন ওরা দুজনে অনেকক্ষণ ঘুরেছিল। ঢাকুরিয়া লেকে বসে বাদাম খেতে খেতে নীলেশ ওর বাড়ির কথা, এলাহাবাদের কথা বলেছিল। ফেরার সময় দুজনেরই খুব মন খারাপ আসন্ন বিচ্ছেদের কথা ভেবে। বাড়িতে ঢোকার আগে তোর্ষা ব্যাগ থেকে বের করে ওর প্রিয় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের একটা কবিতার বই নীলেশের হাতে দিয়ে বলেছিল আবার কবে দেখা হবে? নীলেশ বইটা পেয়ে কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে কোনমতে বলেছিল, এলাহাবাদ থেকে ফিরে দেখা করতে আসবো তোমার কলেজে। সেদিন অবশ্য নীলেশের এই অপ্রস্তুত ভাব কেন ঠিক বুঝতে পারেনি তোর্ষা। পরে এই নিয়ে অনেক হাসি ঠাট্টা হয়েছে। আসলে নীলেশ বাঙলা পড়তে পারতো না।

প্রথম যেদিন কলেজ থেকে বেরিয়ে দেখেছিল গেটের উল্টোদিকে নীলেশ দাঁড়িয়ে আছে সেদিন আর নিজেকে সামলাতে পারেনি তোর্ষা। কোনদিকে না তাকিয়ে এক দৌড়ে রাস্তা পেরিয়ে নীলেশের কাছে চলে গিয়েছিল। সাথের বন্ধুরা তো অবাক আর নীলেশ তো ভয়েই অস্থির। একটা গাড়ি বা বাস এসে গেলে কি হতো ভেবে পরে অবশ্য ওর নিজের ও খুব ভয় লেগেছিল। তারপর হতে প্রত্যেক মাসেই একবার নীলেশ আসতো ওর সাথে দেখা করতে। আসার দিনটা আগে থেকেই জানিয়ে দিত ফোনে। দশটার মধ্যেই চলে আসতো নীলেশ। সেদিন কোন ক্লাশ করতো না তোর্ষা। ও আর নীলেশ সারাদিন ঘুরে বেড়াত। তবু চলে যাওয়ার সময় মনে হতো কি ভীষণ তাড়াতাড়ি দিনটা ফুরিয়ে গেল। খুব মন খারাপ হতো আবার কতোদিন দেখা হবেনা ভেবে। অনেকদিন হতেই নীলেশ বলছিল একটা উইক-এন্ডে দীঘায় বেড়াতে যাওয়ার কথা। তোর্ষার সাহস হতো না। বাড়িতে জানতে পারলে আর রক্ষে নেই। নীলেশ খুব অভিমান করতো ভাবতো তোর্ষা ওকে বিশ্বাস করছেনা। পাশ করার পর চাকরী পেলেই তো ওরা বিয়ে করবে। তাহলে এখন দুদিনের জন্য ওর সাথে দিঘায় গেলে ক্ষতি কি। কিন্তু একা ওর সাথে রাত কাটাতে হবে ভাবলেই তোর্ষার ভীষণ ভয় করতো। খুব লজ্জাও হতো। ওকে কিছুতেই রাজী করাতে না পেরে একবার নীলেশ রাগ করে তিন মাস ওর সাথে কোন যোগাযোগ রাখানি। দেখা করতে আসতো না। ফোন করলে ফোন ধরতো না। তোর্ষার তখন পাগল পাগল অবস্থা। মরীয়া হয়ে ও সোমকে বলেছিল একবার যে করেই হোক নীলেশের সাথে যোগাযোগ করে দিতে। সোমের সাথে নীলেশকে দেখে খুব মন খারাপ

হয়েছিল সেদিন। একমুখ দাড়ি বড় বড় চুল বেশ রোগাও হয়েছে। বোঝাই যাচ্ছিল এই তিনমাস চুল দাড়ি কিছুই কাটেনি। খাওয়া দাওয়াও বোধহয় ঠিক মতো করেনি। অবশ্য সামনে ওদের ফাইনাল তাই অনেক পড়াশোনার চাপও ছিল। তোর্ষার চোখে জল দেখে সোম নীলেশকে বলেছিল, যা এখন তোর প্রেমিকার মান ভাঙ্গা। আমি যাচ্ছি। ওরা দুজনেই সোমকে থাকতে বলেছিল। কিন্তু কোন কারনে সোম সেদিন খুব বিরক্ত ছিল। তোর্ষাকে খুব রুডলি বলেছিল, থাক আর ন্যাকামি করতে হবে না। কাজ ফুরিয়েছে এখন আমি 'যে কাবাব মে হাড্ডি' তা বেশ বুঝতে পারছি। ঠান্ডা স্বভাবের সোম সহজে মেজাজ খারাপ করে না। তাই ওর কথা শুনে ওরা তো অবাক। মনে হয় সোম নিজেও বুঝতে পেরেছিল যে অকারণে তোর্ষার ওপর চেঁচিয়েছে। যাইহোক সোম চলে যাওয়ার পর তোর্ষার চোখে জল দেখে নীলেশ বার বার ক্ষমা চেয়ে বলেছিল, ও খুব সরি আর কোনদিন তোর্ষাকে কষ্ট দেবে না।

পরের মাসে বাড়িতে ওদের কলেজ থেকে মুর্শিদাবাদে এক্সকারশনে নিয়ে যাচ্ছে বলে নীলেশের সাথে দীঘা গিয়েছিল দু-দিনের জন্য। সকাল আটটা নাগাদ এসপ্লানেড্ থেকে বাস ছাড়ার পর প্রথমে খুব টেনসড্ থাকলেও বাস যত কলকাতা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছিল তত আস্তে আস্তে ভালো লাগতে আরাম্ভ করেছিল। পাশে নীলেশ চুপ করে ওর হাত ধরে বসে জানালার বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। ওকেও বেশ নার্ভাস মনে হচ্ছিল। কখন যে সব টেন্‌শান ভুলে দুজনে গল্প করতে শুরু করেছে তা আর খেয়াল করেনি। আগের থেকেই হোটেল বুক করে রেখেছিল নীলেশ। হোটেলে পৌঁছে হাত মুখ ধুয়ে নীচের ডাইনিং রুমে চা আর চিকেন কাটলেট খেয়ে ওরা বীচে গিয়েছিল সান সেট্ দেখবে বলে। দিনটা ছিল খুব সুন্দর। হাঁটার জন্য একেবারে পারফেক্ট। অনেকক্ষণ হাঁটার পর হানিমুনে আসা এক ইয়াং কাপলের সাথে বালিতে বসে ওরা সান সেট্ দেখেছিল। ওরা জানতো না যে সেদিন পূর্ণিমা ছিল। থালার মতো বড় চাঁদ ওঠার পর অপার্থিব এক আলোয় ঝলমলে দীঘাকে ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছিল। চাঁদের আলোয় ঢেউ গুলি মাথায় ফ্‌সফরাসের মুকুট পরে ওদের পায়ের কাছে বার বার এগিয়ে আসছিল। নীলেশ পকেট থেকে ছোট্ট একটা রূপোর সিঁদুরের কৌট বের করে ওকে অল্প সিঁদুর পরিয়ে বলেছিল সবাই অগ্নি সাক্ষী করে বিয়ে করে আর আমি সমুদ্রকে সাক্ষী করে তোমাকে বিয়ে করলাম। আজ আমাদেরও হানিমুন। লজ্জা পাওয়া তোর্ষার মুখ তুলে ওর সেই সুন্দর চোখ তোর্ষার চোখে এক পলকের জন্য রেখে অল্প অল্প কাঁপতে থাকা তোর্ষার ভেজা ভেজা ঠোঁট দুটো নিজের ঠোঁটে মিশিয়ে দিয়েছিল। সেই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল আকাশ বাতাস সব নীরব হয়ে ওদের দেখছে। তোর্ষা নিজের বুকে ঢেউ ভাঙ্গার শব্দ শুনতে পারছিল। আলমারিতে শাড়ির নীচে এখনো ওই সিঁদুরের কৌটটা আছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবলো জিনিসপত্র সব থাকে শুধু মানুষ চলে যায়।

দীঘা থেকে ফেরার কিছুদিন পরেই দিল্লীতে ভালো একটা কাজ পেয়ে জয়েন করে নীলেশ। তোর্ষা তখন মাষ্টার্স করছে। শেষ হতে আরও এক বছর। দু-জনের মধ্যের দূরত্বটা ওরা ফোন আর চিঠিতে কমাতে চেষ্টা করতো। সোমও তখন চাকরী নিয়ে হায়দারাবাদ গেছে। দাদা শিকাগোতে। রুনুর বিয়ে হয়ে গেছে। ভীষণ একা লাগতো তোর্ষার। অবশ্য ততদিনে দু-বাড়িতেই জানে ওদের সম্পর্ক। তোর্ষার ফাইনাল হয়ে গেলেই বিয়ে হবে। তারপর একদিন সেই আকাঙ্ক্ষিত বিয়ের দিন এসে গেল। সাতদিন আগের থেকে আত্মীয় স্বজনে বাড়ি ভর্তি। ভোররাত্রে উঠে দধিমঙ্গল। তারপর অধিবাসের তত্ত্ব আসার পর গায়ে হলুদ। সবাই মিলে হলুদ খেলার হই চই। দুপুর থেকেই কনে সাজানো। মনে আছে বর বেশে আসা চেনা নীলেশকে মনে হচ্ছিল অচেনা। শুভ দৃষ্টির সময় লজ্জায় তাকাতে পারছিলনা তোর্ষা। বিয়ের পরের দিন গাঁটছড়া বেঁধে কাঁদতে কাঁদতে নীলেশের সাথে এলাহাবাদ যাওয়া। নতুন বাড়ি নতুন পরিবেশ। বৌ-ভাত ফুলশয্যা। তিনদিনের জন্য চট-জলদি নৈনিতালে হানিমুন করতে যাওয়া। সব মনে হয় স্বপ্ন। ঝড়ের মতো কেটে গিয়েছিল দিন। নতুন চাকরী তাই নীলেশের বেশী ছুটি ছিল না। যাইহোক হানিমুন থেকে ফিরে আবার কলকাতা ফেরা দ্বিরাগমন করতে। কথা ছিল তিনদিন কলকাতায় থেকে নীলেশ দিল্লী ফিরে যাবে আর সপ্তাহ দুই পরে সব গুছিয়ে তোর্ষা দিল্লী যাবে। তোর্ষার আর দিল্লী যাওয়া হয়নি। সবাই মিলে এয়ারপোর্ট গিয়েছিল নীলেশকে সি অফ্ করতে। তোর্ষার মন খুব খারাপ। সিকিউরিটিতে ঢোকার আগে নীলেশ ওর হাত ধরে বলেছিল, বোকা মেয়ে এত মন খারাপ কেন? দু-সপ্তাহ পরেই তো তুমি আসছ। তোর্ষা কিছু না বলে অল্প হেসেছিল। যেতে যেতে পেছন ফিরে তাকিয়ে হাত নেড়ে নীলেশ ঢুকে গেল। তখন কে জানতো ওই শেষ দেখা। তোর্ষা আর কোনদিন ওর প্রিয় সেই সুন্দর চোখ দেখতে পাবেনা। ওরা বাড়ি ফিরে

আসার আগেই নীলেশদের প্লেন ক্র্যাশ হয়েছিল । বাড়ি ফিরে প্লেন ক্র্যাশের খবর শোনার পর কি হয়েছে তোর্ষার আর মনে নেই । ওদের বিয়ের পর সোম তখন সবে হায়দারাবাদ ফিরে গেছে । খবর পেয়ে পরের দিন সোম আবার চলে এসেছিল । মনে আছে দিনের পর দিন ও শুয়ে থাকতো আর যখনই চোখ খুলতো দেখতে পেত বিছানার পাশে সোম বসে আছে । প্রায় মাস খানেক পর তোর্ষা একটু ভালো হলে সোম হায়দারাবাদ গিয়ে কলকাতার অফিসে ট্র্যানস্‌ফার নিয়ে চলে আসে । উঃ আর ভাবতে পারছেনা । সেই দিনটার কথা মনে হলে এখনো ওর সমস্ত শরীর জ্বালা করে । মনে করতে না চাইলেও বার বার সেই দিনটা ওকে তাড়া করে । তাড়াতাড়ি উঠে শাওয়ারের নীচে গিয়ে দাঁড়ায় তোর্ষা । কতক্ষণ যে দাঁড়িয়ে ছিল খেয়াল নেই । হঠাৎ দরজায় ধাক্কা শুনে শাওয়ার বন্ধ করে কোনমতে গা মুছে জামা কাপড় পরে বাথরুম হতে বেরিয়ে দেখে প্রায় আটটা বাজে । ঈস্ কতো দেরী হয়ে গেল । সবাই কি ভাবছে । মা নিশ্চয়ই খুব চিন্তা করছে । আজকাল মা ওর জন্য অল্পতেই ভীষণ চিন্তা করে ভাবতে ভাবতে দরজা খুলেই দেখল হাতে চায়ের কাপ নিয়ে হাসিমুখে সোম দাঁড়িয়ে আছে । ওকে দেখে অল্প মাথা নীচু করে বলল, গুড মর্নিং মেমসাহেব । আপনার চা । সোমের হাত থেকে চায়ের কাপ নিয়ে পাশের টেবিলে রেখে এই প্রথম তোর্ষা দু-হাত বাড়িয়ে ওকে কাছে টেনে ওর বুকে মাথা রেখে শুনতে থাকে নীচের টিভি থেকে ভেসে আসা বন্যার গান — 'সকাল বেলা চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কি / .... । জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে / যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙল ঝড়ে'।

দূর বহুদূর অনেক দূর

মনীষা বসু

দূর বহুদূর অনেক দূর হতে
অভিমানের ডাক ফিরে ফিরে আসে ।

দামাল হাওয়ায় ভেসে যায় সব
স্পর্শ গন্ধ সুখ স্মৃতি
এক অজানা ইঙ্গিত দিয়ে ।

মনে পড়েনা সুদূর কোন অতীতে
কিসের অঙ্গীকারে বেঁধে ছিলেম নিজেকে ।

গোধূলির উদাসী আলোয় যখন
হাত বাড়িয়ে ধরতে যাই
ভুলে যাওয়া মুছে যাওয়া দিন
অন্ধকার রাতের আকাশে অশনি সংকেতের মতো
মুহূর্তে মিলিয়ে যায় সব দূর বহুদূর অনেক দূর ।

অপেক্ষার ক্লান্ত ঘুমে ফিরে আসে অজানা ব্যথা
স্বপ্নের সাঁকো বেয়ে ।

শ্যাওলা ধরা প্রাচীন পুকুরের কালো জলে
একরাশ কান্না তখন ঝিকিমিকি করে ।

দূর বহুদূর অনেক দূর হতে
কে যেন নিরন্তর অভিমানের ডাক পাঠায় ।

মিনতি

মঞ্জু চট্টোপাধ্যায়

শরতের এই শীতল হাওয়ায়
দোলা লাগে কাশ ফুলে
শিশির ধোওয়া শ্যামলা আচঁলে
ধরা সে শিউলি তোলে
দোয়েল, শ্যামার কলতানে শুনি
ঐ কার আগমনী ।
বছরের পরে 'মা' আসেন ঘরে
তারি শুভক্ষণ মানি ।
জানাই তোমারে প্রাণের আকুতি
এস মা মোদের ঘরে
সন্তান মোরা জানাই প্রণতি
ও রাঙা চরণ পরে ।
ধরণীরে কর সঞ্জিবনী দান,
তব আগমনে আসুক কল্যাণ
'শান্তি আশীষ' দাও শিরোপরে
'প্রেম-দীপ' জ্বাল সবার অন্তরে
ঘুচে যাক যত ভেদাভেদ জ্ঞান
মানবতা — বোধে জাগুক এ প্রাণ ।

পথের সাথী

রঞ্জিতা চট্টোপাধ্যায়

শিয়ালদা স্টেশনে কোচবিহারগামী তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেস তখন ছাড়ার অপেক্ষায় । যাত্রীদের ভিড়, ঠেলাঠেলি, মালপত্তরের ধাক্কাধাক্কি আর নানাবিধ কলহ কোলাহল — সব মিলিয়ে চারপাশের পরিবেশেটিও সেই কথা জানান দিচ্ছে । মণিময়বাবু তাঁর অল্পস্বল্প মালপত্র নিয়ে নিজের জন্য রিজার্ভ করা কামরাটি খুঁজে পেতে যখন ট্রেনে উঠলেন ট্রেন ছাড়তে তখন আর মাত্র মিনিট দশেক বাকী । মণিময় বাবুর এই এক অভ্যাস — শেষ মুহূর্ত্তের আগে কোন কাজেই তাঁর ঠিক গা ঘামে না । ভদ্রলোকের বয়স পঞ্চাশ পেরিয়েছে প্রায় বছর পাঁচেক আগে । কিন্তু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়ায় তাঁকে দেখলে পঁয়তাল্লিশের বেশী বলে মনে হয় না । পেশায় তিনি কলকাতা সংলগ্ন এক শহরতলীর একটি উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক । সম্প্রতি তাঁর এই কোচবিহার যাত্রার কারণ হল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিজের একমাত্র পুত্রের স্নাতকোত্তর পর্যায়ের পড়াশোনা সংক্রান্ত খোঁজখবর নেওয়া ।

মণিময়বাবু আদতে বিজ্ঞানের ছাত্র । রসায়নশাস্ত্রে তাঁর প্রথাগত উচ্চশিক্ষার ডিগ্রী । কিন্তু মানুষটি সাহিত্যের, বিশেষত ধ্রুপদী সাহিত্যের বিশেষ অনুরাগী । তাঁর মধ্যে লুকিয়ে আছে এক কবি মন যা বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে । ট্রেন যখন নবদ্বীপ পেরোলো ঘড়ির কাঁটা অনুযায়ী সময় তখন প্রায় বিকেল সাড়ে তিনটে । তবে বাইরে তাকালে সে কথা বোঝার জো নেই । আকাশ ছেয়ে গেছে কালো মেঘে । বিকেলের সোনালী আলো নিঃশেষে মুছে গিয়ে চারপাশে ঘোর হয়ে এসেছে অন্ধকার । আদিগন্ত মাঠের উপর স্তরে স্তরে জমে উঠেছে মেঘ । জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সেই ঘন মেঘের কালিমা দেখেই মণিময়বাবুর মনে কাব্যিক অনুপ্রেরণা জেগে উঠল । স্বতঃস্ফূর্তভাবে তিনি গুনগুন করে উঠলেন রবি ঠাকুরের বিখ্যাত একটি গানের কলি, 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে আঁধার করে আসে' । মণিময়বাবুর বাবা ছিলেন সুকণ্ঠের অধিকারী । তাঁর স্ত্রী'ও সুগায়িকা । তাই বাড়ীতে চিরকালই গানবাজনার চর্চা চলেছে নিয়মিত । মণিময় বাবুর নিজের গলাটিও বেশ দরাজ এবং সুরসমৃদ্ধ । তবে তেমনভাবে গানবাজনা চর্চার সুযোগ তাঁর কোনদিনই হয় নি । সময়ে অসময়ে তাই প্রাণের আবেগে গান গেয়ে উঠলেও গানের কথাগুলি তাঁর অজানা বলে সুরে শব্দ বসাতে পারেন না । এক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হল না । গানটির দ্বিতীয় লাইনে পৌঁছেই হোঁচট খেলেন তিনি। 'আমায় কেন বসিয়ে রাখ ----'। উঁ উঁ করে সুর ভাঁজাটি তবে বন্ধ করলেন না । হঠাৎ কানে এল তাঁর উল্টোদিকে বসা ভদ্রলোকটি তাঁর গানের পদপূরণ করছেন ।

ট্রেন চলতে শুরু করার পর থেকে এই প্রথম ভদ্রলোকের দিকে নজর পড়ল মণিময়বাবুর । বয়সে তিনি তাঁর থেকে কিছু বড়ই হবেন । চেহারায় চোখে পড়ার মতো বিশেষত্ব কিছু নেই । অমায়িক মুখটিতে বেশ প্রত্যয়ের ছাপ । ক্রমশ গানের পদপূরণের মধ্যে দিয়েই দুজনের আলাপ জমে উঠল । মেঘ রাগের আলাপ শুনলেই যে আকাশের মেঘ হৃদয়েও বিস্তার লাভ করে এ ব্যাপারে একমত হতে পেরে দুজনের আলাপচারিতা যেন একটা অন্য মাত্রা পেল । কথায় কথায় মণিময় বাবু জানতে পারলেন উল্টোদিকে বসা সঙ্গী ভদ্রলোকটি কোচবিহার রাজ্য সরকারের অফিসের ল্যান্ড রেজিস্ট্রার । থাকেন কোচবিহার শহরে একটি হোটেল ভাড়া নিয়ে । সপ্তাহান্তে শহরতলীতে নিজের বাড়ীতে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার কাছে ফিরে যান । কর্মসূত্রে মাঝেমধ্যেই তাঁকে কলকাতা কোচবিহার যাতায়াত করতে হয় । গানে, গল্পে চলন্ত ট্রেনের ভিতর সময় বেশ তাড়াতাড়ি কেটে গেল । এরই মধ্যে কখন যেন মণিময় বাবু তাঁর সঙ্গীর সম্বোধনে মণিবাবু হয়ে উঠলেন । রাত্রে খাওয়ার সময় মণিবাবুর বাড়ী থেকে আনা লুচি, আলুচচ্চড়ি আর কড়াপাকের সন্দেশ খেলেন সঙ্গী ভদ্রলোক আর তাঁর বাড়ী থেকে আনা রুটি, ডিমের ডালনা আর রসমালাই খেলেন মণিবাবু । রাতে শোওয়ার আগে বেশ একটু চিন্তায় পড়লেন তিনি । ট্রেনের উপরের বার্থে শুলে ঘুম আসতে চায় না তাঁর । অথচ টিকিটের নম্বর অনুযায়ী তাঁর সেখানেই শোওয়ার কথা । উল্টোদিকের ভদ্রলোকটি যেন যাদুবলে তাঁর মনের কথা জানতে পেরে বলে উঠলেন, 'মণিবাবু, আপনি নীচের বার্থে থাকুন, আমি উপরে চললাম ।'

এবার মণিবাবুর মনে কেমন যেন অজানা আশঙ্কা দানা বাঁধতে লাগল । তাঁর সহযাত্রীটি ভদ্রলোকের ছদ্মবেশে ধান্দাবাজ গুন্ডা নন তো? হয়তো মণিবাবু ঘুমিয়ে পড়লেই বিশেষ ইঙ্গিতে চেলাদের জড় করে তাঁর জিনিসপত্র সব হাতিয়ে নেবেন । ভাগ্যক্রমে তাঁর সঙ্গে মহার্ঘ্য বস্তু বা টাকা পয়সা বিশেষ কিছু ছিল না । তাই মনের ভাব মনে চেপে রেখে তিনি ঘুমনোর জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন । এবং যথাসময়ে ঘুমিয়ে পড়লেনও । ঘুম ভাঙল একেবারে পরের দিন সকালে ট্রেনের ফেরিওয়ালাদের চা ফেরি করার হাঁকডাকে । নিদ্রাজড়িত আলস্য শরীর থেকে ঝেড়ে ফেলে উঠে পড়লেন মণিবাবু । ট্রেনের আন্যান্য যাত্রীরাও তখন শশব্যস্তে কামরার ভিতরে এদিক ওদিক করতে শুরু করে দিয়েছে । মণিবাবু আড়চোখে তাঁর সহযাত্রী সঙ্গীটির দিকে চাইলেন । তিনি তখন চোখে চশমা লাগিয়ে গভীর মনোনিবেশ সহকারে একটি ফাইল দেখছেন । আর একটি উজ্জ্বল চেহারার তরুণ যুবক পাশ থেকে 'স্যার স্যার' করে নানা প্রশ্নবাণে তাঁকে জর্জরিত করে চলেছে । এতক্ষণে মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মণিবাবু । সঙ্গের আলাপী ভদ্রলোক যে সত্যিই কোচবিহার রাজ্যসরকারের একজন পদস্থ কর্মী এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহই রইল না তাঁর । প্রশ্নোত্তর পর্ব শেষ হলে মণিবাবুর সঙ্গে ছোকরাটির আলাপ করিয়ে দিলেন তিনি । ছোকরা মণিবাবুকে উদ্দেশ্য করে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোচবিহারে কোথায় উঠছেন?' মণিবাবুর সদ্য আলাপ হওয়া সঙ্গী তৎক্ষণাৎ বলে উঠলেন, 'আরে আজকের দিনটা আর কালকের অর্ধেক বেলা উনি আমার সঙ্গে পান্থনিবাসেই থাকবেন । তুমি আর দীপক ওনার দেখাশোনা করবে ।' বোঝা গেল যে দীপক আর একজন কোন অধস্তন কর্মচারীর নাম । গলায় আদেশের সুর না থাকলেও সঙ্গীর কথার প্রতিবাদ করার কোন সুযোগ মণিবাবু পেলেন না ।

যথাসময়ে ট্রেন থামল কোচবিহার স্টেশনে । জনৈক রিক্‌শাওয়ালা তাঁদের দুজনকে তুলে নিল তার রিক্‌শায় । তার ভাবভঙ্গী আর কথাবার্তা শুনে বোঝাই গেল যে সওয়ারীদের একজন তার ভালই পরিচিত । নির্দেশ ছাড়াই সে তাঁদের পৌঁছে দিল নির্ধারিত গন্তব্যে । মোটামুটি মাঝারি মানের একটি হোটেল । নাম 'পান্থনিবাস' । সেখানে প্রাতরাশ সেরে মণিবাবু যে বিশেষ কাজে কোচবিহার এসেছেন তা সারতে বেরিয়ে পড়লেন । বেরোনোর আগের মুহূর্তে ল্যান্ড-রেজিস্ট্রার বাবু তাঁকে বললেন, 'আমার অফিসের দীপক আপনাকে একটা রিক্‌শা ঠিক করে দিচ্ছে । যতক্ষণ দরকার লাগে ওকেই রেখে দেবেন সঙ্গে ।' কোচবিহার শহরের দর্শনীয় স্থানগুলির একটি তালিকাও তিনি মণিবাবুকে শুনিয়ে দিলেন । কাজে ও অকাজে নানা জায়গায় ঘোরাঘুরি করে শেষবারের মতো মণিবাবু দীপকের ঠিক করে দেওয়া রিক্‌শাটিতে চড়ে বসলেন পান্থনিবাসে ফেরার উদ্দেশ্যে । তখন শরীর তাঁর ক্লান্তিতে ভেঙে আসছে । স্থানীয় বাজারের ভিতর দিয়ে যখন রিক্‌শাটি ধীর গতিতে এগিয়ে চলেছে তখন কচুরি ভাজা আর নানাবিধ মশলার ভেসে আসা গন্ধে মণিবাবুর জঠরাগ্নিও তেজে জ্বলে উঠল । এতটা ক্ষিদের বোধ এতক্ষণ টের পান নি । 'মহামায়া মিষ্টান্ন ভান্ডারে'র সামনে রিক্‌শাটিকে তিনি দাঁড়াতে বলতেই চালক ফণী অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কি করবেন বাবু? এখানে নেমে কচুরি আর রাজভোগ খাবেন নাকি?' মণিবাবু জবাবে বললেন, 'আরে আমি একা কেন? তোমারও নিশ্চয়ই ক্ষিদে পেয়েছে ভালই । সারাদিনে ঘোরাঘুরি তো কিছু কম হয় নি ।' ফণী কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'না বাবু, আমি এখানে খাব না । স্যার খুব রাগ করবেন তা হলে । আর আমার মতে আপনিও একেবারে পান্থনিবাসে ফিরেই চা আর জলযোগের পর্ব সারুন । স্যার নিশ্চয়ই আপনার জন্য অপেক্ষা করবেন ।'

কথা না বাড়িয়ে পান্থনিবাসেই ফিরে এলেন মণিবাবু । ফণী ঠিকই বলেছিল । সন্ধ্যাকালীন জলযোগ ফণীর 'স্যার' এর সঙ্গে সেরে গল্প আড্ডায় আরও ঘন্টা তিনেক কাটিয়ে দিলেন মণিবাবু । এই পান্থনিবাসে প্রাতরাশ ও মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা তাকলেও নৈশাহারের কোন বন্দোবস্ত নেই । পান্থনিবাসের উল্টোদিকের খাবারের দোকানে তাই দুজনে গেলেন রাতের আহার পর্ব সমাধা করতে । খুবই সাধারণ খাবার — রুটি, ডাল, ফুলকপির তরকারি, ভাত আর মাছের ঝোল । খাওয়া শেষ করে মণিবাবু ওয়ালেট বের করতে গেলেই অপরজন বাধা দিলেন । বললেন, 'আপনি আমার অতিথি। তাই এই ভারটি আমারই ।' এখনও গলার স্বরে আদেশের ভঙ্গী মোটেও নেই । কিন্তু তাঁর বলার মধ্যে এমন কিছু ছিল যাতে মণিবাবু বিনা বাক্যব্যয়ে নিরস্ত হলেন ।

ঘটনাটি কিন্তু তাঁকে বেশ বিব্রত করতে শুরু করল ।

তিনি ভেবে দেখলেন শিয়ালদা স্টেশনে তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসে চড়া থেকে আর তখন পর্যন্ত তাঁর থাকা খাওয়া বা ঘোরাঘুরি বাবদ কোন খরচাই হয় নি । এমন কি রিক্‌শা চালাল যে ছোকরা সেও ভাড়ার টাকাটি না নিয়েই বিদায় নিয়েছে । মনে বেশ অস্বস্তি নিয়ে শুতে গেলেন তিনি । তবে ক্লান্ত শরীর আর ভরা পেটের কল্যাণে মানসিক অস্বস্তি সত্ত্বেও ঘুমিয়ে পড়লেন সহজেই । সকালের সূর্যের জোরালো আলো পুবের জানালা দিয়ে চোখে লাগতে ঘুম ভাঙল তাঁর । আজ ফেরার পালা । ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখলেন যে অপর ভদ্রলোকটি ইতিমধ্যেই তৈরী হয়ে সংবাদপত্রের পাতায় চোখ বোলাচ্ছেন । মণিবাবুর ট্রেনের সময় জেনে নিয়ে বললেন, 'আপনি তৈরী হয়ে থাকবেন । আমি জিপ নিয়ে এসে আপনাকে স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে আসব ।'

যথাসময়ে জিপ এসে হাজির হল । তাঁরা দুজনে যখন স্টেশনে পৌঁছলেন মণিবাবুর ট্রেন ছাড়তে আর মাত্র দশ মিনিট মতো বাকী । পকেট থেকে ছোট্ট নোটবই আর কলম বের করে সঙ্গীকে বললেন তিনি, 'আপনার নাম আর ফোন নম্বরটা যদি দেন তাহলে ফিরে গিয়ে যোগাযোগ করব । আপনার আপ্যায়ন মনে থাকবে আমার ।' সঙ্গী ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ নমস্কারের ভঙ্গীতে দুইহাত জোড় করে কপালে ঠেকালেন । বললেন, 'পথের আলাপ পথেই থাক না! একে আর ঘরে টেনে নিয়ে গিয়ে লাভ কি?' মণিবাবু হতবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন উত্তরদাতার দিকে । তাঁর বিস্ময়ের ঘোর কাটতে না কাটতেই হৈ হৈ করে ট্রেন এসে পড়ল । নিজের সীটটি খুঁজে নিয়ে বসে পড়লেন তিনি । ট্রেন যখন ধীরে ধীরে কোচবিহার স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম ছাড়াচ্ছে তখন জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই তাঁর পথের সাথীর আপাত বিশেষত্বহীন চেহারাটি মণিবাবুর চোখে পড়ল শেষবারের মতো । শান্ত ভঙ্গীতে তখনও দাঁড়িয়ে আছেন তিনি । অপেক্ষা করছেন ট্রেনটির শেষ কামারাটির প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য ।

ফেরার পথে আগাগোড়া ঘটনাটি ভাবতে ভাবতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন মণিবাবু । ঘুম ভাঙতেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকালেন । আকাশে, খোলা মাঠে আর বড় বড় গাছের মাথায় তখন লেগেছে গোধূলির সোনা রঙ । ধানের শিষে খেলে যাচ্ছে ঢলে পড়া সূর্যের লালচে আভা । দূরে দূরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা খড়ের চালের মাটির ঘরগুলোকেও মনে হচ্ছে স্বপ্নপুরী । মণিবাবু আর থাকতে পারলেন না । গভীর আবেগে গান ধরলেন, 'এ কি নিবিড় বেদনা বন মাঝে / আজি পল্লবে পল্লবে বাজে / দূরে গগনে কাহার পথ চাহিয়া —', — পরের কথাগুলো আর তিনি মনে করতে পারলেন না কিছুতেই । পথের সাথীর অনুপস্থিতি বড় বেশী করে টের পেতে লাগলেন । বিনা চেষ্টাতেই মনে বারে বারে ভেসে উঠতে লাগল তাঁর বৈশিষ্ট্যহীন চেহারাটি ।

হ্যামলেটের প্রশ্ন

শুভম সান্যাল

মুখবন্ধ : এই কাব্যের চরিত্রদের যদি ইহজগতের কোন ব্যক্তিদের সহিত কোনরূপ সাদৃশ্য থাকে তাহা নিতান্তই কাকতালীয় ..... নহে ।

চলুন, সময়-যন্ত্রে চড়ে আপনাদের নিয়ে যাই আবার ২০০৬ সালে, প্রেসিডেন্ট রাহুল দেবের আমলে, শিকাগো তখন সরগরম একটাই প্রশ্নে — 'টু বী অর নট টু বী ?'

''টু বী অর নট টু বী ?'' হ্যামলেটের ঠিক পরে
আজ আবার প্রশ্ন করেন সবাই ঘরে, ঘরে
'জীবন-মরণ' সমস্যা কিন্তু এ নিতান্ত নয়
শিকাগো করবে 'এন. এ. বি. সি.' ? এই হল সংশয় !

রাহুল মোদের দেবতুল্য, রাহুল রাষ্ট্রপিতা
খাদ্য-পংক্তিতে দেখি ... রাহুলই খাদ্যদাতা !
সেই রাহুলই শুরু করেন সমাধানের সৃষ্টি
তাঁর কমিটি বাছল ছেঁকে 'অনুসন্ধান' গোষ্ঠী ।

১২ জনের গবেষণায় পাছে হয় ভুল ফল
তাই গড়া হয় ১৩ জনের 'উপদেষ্টা' দল !
রাহুলদেব করলে তখন তার ফতোয়া জারী
'রিসার্চ কর এন. এ. বি. সি. কি করতে পারি ?'

১২ ভুতে ১২ হপ্তা দিন রাত্তির খাটে,
ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়িয়ে তারা ছোটে ।
অতনু ও ঝুমুর ঘোরে 'ভেনু'র খবর নিতে,
বাকি দশজন খোঁজ করে যায় অন্য শহরেতে ।

পৃথ্বী ভাবে, 'গত জন্মে হেরেছি পানিপতে
এই জনমে মেক-আপ দেব এন. এ. বি. সি. জিতে ।'
দীপু ভাবে, ন্যাবসি এলে সেও করত কত !
যদি না টুটুর সাথে ডালাস যেতে হত !

বিক্রম সে বুদ্ধি করে বাজেট করে আসান !
'নিয়ম মানার' নিয়ম লেখায় খুদি তো ঠিক পাষান !
রিসার্চের ফল ঝিং-চ্যাক এক প্রেসেনটেশান করে
পৃথ্বীরাজ তাক লাগাল জি. বি. এম.-এর ঘরে ।

বলল সে, 'মনে রেখো আমরা এনে দি'সি
শিকাগোতে ১২ সনে আবার এন. এ. বি. সি. !'
তবুও শেষে মীমাংসা হল না এই জটে
ভোট হবে কি ভোট হবে না, তাই উঠল ভোটে !

তিনটি মাস চিন্তা করে ঠিক করে নিন মন
সরস্বতী পুজো এলে ভোট দেবেন তখন !
হোক না হোক বঙ্গমেলা কিংবা এন.এ.বি.সি.
আমরা যেন থেকেই যায় একই বি. এ. জি. সি. !!

A Retrospective Interview with Dr. Sudip Bose

Bakul Banerjee

Within the large Indian population in the Chicagoland area, Bengali immigrants are a minority. However, for the past thirty years and more, this community has come together to continue with their cultural and lingual traditions. Like other immigrant groups, we raised our children in that environment while attempting to enrich the society at large. Like other tight-knit immigrant communities, we look for role-models within our community. Fortunately, we do not have to search very hard. Former Army Major Sudip Bose, M.D., U.S. Army 1st Cavalry Division, is a wonderful role model. I always knew about him because his parents were good friends of mine for a long time. However, the Iraqi war changed that level of knowledge. Sudip went to war as an emergency physician on the battlefront. He was the first person I met as a young adult who grew up to play a key role in the war. When he went to Iraq, the war was no longer impersonal. Subhasda and Aloka's only son, and Simita's only brother was out there, in that hostile and barren battlefield. In those early days, CNN splashed war scenes all over the TV screens and my heart kept beating faster thinking of Aloka at her home only a few miles away.

After serving his country and his fellow soldiers for 15 months, Sudip returned home at the conclusion of the infamous Second Battle of Fallujah that ended in December 2004. He served one of the longest combat tours by a physician since WWII and was the physician selected to treat Saddam Hussein after his capture. I met him at the Bangamela 2005, the Bengali conference held at Chicago, and cheered for him. He became an inspiration to us, both young and old. During that gathering, many young people told me that they were impressed not only by his bravery but also his demeanor. He was very personable. Because of the internet, it is easy to find many facts about him. There are many websites presenting details of his outstanding accomplishments and awards. However, I wanted to know how he is defining himself now. Here is a narrative of my conversations with him.

Bakul: You won many awards and accolades,

both because of your military and medical accomplishments. This includes the Military's Bronze Star, CNN Hero, ACEP National Emergency Medicine Teaching Faculty Award, Leading Physicians of the World, and many others. Chicago Bengalis are very proud of you. However, tell me about something we would not know that you are very proud of.

Sudip: I am very grateful to have the support of the community. As a big advocate of healthcare, I am a big champion of physical activities. I enjoy working out, especially running. I've won several physical fitness awards during my military years and recently participated in the Spartan Race. I frequently give lectures on nutrition/healthy living and healthcare as well as give health tips on my social media pages (Facebook: "Like" Dr. Sudip Bose) and websites. (www.TheBattleContinues.org)

Bakul: Bengalis in general are not much into physical activities. Tell me who inspired you in this area?

Sudip: My dad was always a great believer in exercise. He would ride his bike to work when he could. He encouraged me to be active when I was a kid

and swimming and running was part of our daily routine. Bengalis excel in many arenas, but without good health we could not succeed in our careers or academics.

Bakul: When the Bengali community heard that you were in Iraq, they banded together and sent many care packages to you. Tell me what you felt when you received them.

Sudip: I was overwhelmed with gratitude and the support was invaluable to me. The living conditions were the bare minimum. You realize how just a small gesture can make a big difference in someone else's life. Many people struggle with just the basics. Packages took three weeks to arrive and in the process sat in 130 degree weather. Although most of the military food was vacuum packed and non-perishable, every once in a while I would receive home-cooked food that didn't quite make it through the desert heat because of the length of time it took to get there. I was very appreciative that people made the effort to send me food. Bakul: Certainly.

Sudip: Somehow folks in Chicago got the message that we were running low on toilet paper. Next thing we know is we are receiving boxes and boxes of toilet paper. The whole unit became appreciative of the Bengali Association for their generosity. Experiences like that made me realize how important community support is. Sometimes we take for granted the little things.

Bakul: You went through extensive military training and were somewhat prepared for the death and mayhem. As shown in the CNN video, I understand that you treated Iraqi children with traumatic injuries during your free time. Such experiences with children must have left a lasting impression on you. Tell me what I could learn from your experience, even if only indirectly.

Sudip: It's unfortunate but many people are born into this world not knowing what freedom is like or never lived to experience freedom. It's heartbreaking. Being in a war zone and seeing what people go through makes you grateful for what you have and makes you want to help others. Also, seeing what our soldiers sacrifice just for us to be able to have our freedom is amazing.

Bakul: Since you transitioned out of military in 2007, you have been engaged in many interesting activities. Apart from being a successful doctor of emergency medicine and motivational speaker, you have your own medical training business and television segment. You have also established a long term mission for yourself. Tell me about your organization "The Battle Continues" and your vision about the project

Sudip: I would be honored if the Bengali community would visit www.TheBattleContinues.org. If they choose to donate, they can help others in the same incredible way they helped me 10 years ago. If they connect with me on Facebook (Dr. Sudip Bose), they can receive health tips to stay healthy. I've combined my prior experience and started www. The Battle Continues.org which is a non- profit organization to advocate for veterans and educate the public on healthcare. I enjoy giving back and educating others. I regularly give lectures around the world to help raise awareness on the issues that veterans face upon return from war. I'm also a firm believer that our health is our single most important asset so I use The Battle Continues.org to promote healthy living and help raise awareness on health care issues so that people can make better informed decisions regarding their health. I frequently speak at corporations and use the lessons I learned in combat and in the ER to teach leadership. My lectures and media appearances allow me to raise awareness and raise funds for the The Battle Continues.org.

Bakul: We talked about the serious stuff. Now, tell me what fun stuff you like to do.

Sudip: In my free time I enjoy working out, swimming, running, reading, traveling and hanging out with family and friends.

Bakul: I wish to thank you very much for taking time for this interview and wish you all the best in your future endeavors.

Sudip: Thank you for taking the time to write this. I will never be able to thank the community enough for their help during a very difficult time. After all, when times get difficult, it is our community who helps us. It would be great if every veteran had a community of support like the BAGC.

A note to the BAGC community: The Battle Continues was recently approved as a 501 (see) tax deductible charity. Please visit Dr. Sudip Bose's website http://www.thebattlecontinues.org/ and support his mission in any way you can. Even a $5 donation can make a difference. Follow him on Facebook (Like "Dr. Sudip Bose") for health tips and his weekly CBS Health segment.

QUIZ

Basanti Banerji

Choose 1 or more answer.

1. This plant produces small spindle-shaped pods and aromatic seeds.

a. It is produced in India.

b. Guatemala is the biggest producer and exporter of this spice

c. Its name is derived from the Persian language

d. Used as a flavoring agent in cooking (masala)

2. These seeds have long been used as a folk remedy to aid sleeping. Its paste is used in preparing a common Bengali dish and in cuisines in other countries.

a. Recently referred in connection with Taliban and Afghanistan

b. To make up for the trade deficit, it was imported to China by a European power.

c. In Jewish custom, pastries filled with the seeds are made exactly a month before Passover.

3. It is a very well known aquatic perennial plant that grows in muddy water.

a. Its flowers have the remarkable ability to regulate and maintain the temperature of 86-95 degrees Fahrenheit as humans and warm-blooded animals do, even when the air temperature drops to 50 degrees Fahrenheit.

b. This flower symbolizes purity of body, speech and mind in Buddhist tradition.

c. National flower of Republic of China.

d. Known for its very short stalk.

4. A tree of Mulberry family, that is native to South and Southeast Asia, across Africa, and extensively cultivated in Brazilian coastal region, producing an enormous size fruit.

a. The English name was derived from a Spanish word

b. National fruit of India

c. Common Bengali proverb/phrase with reference to the unripe fruit indicating precocity

5. A variety of melon in its local name, distinctly warty exterior, originated in Indian sub-continent and was exported to China in 14th century.

a. The fruit's flesh is similar to cucumber, with seeds inside.

b. Contains substances helpful in controlling a metabolic disease.

c. A significant ingredient in Japanese cooking credited with higher life expectancy.

d. It has a distinct sweet taste.

(The answer is on page 73)

To the Parents of School Massacres

Debdas Banerjee

He or she on those violent days lost their lives
Boys and girls, just about to bloom with vigor and splendor,
Loved their parents, siblings, kith and kin and now
are left only to suffer forever and ask " Why This?"

I feel sad, the whole world is sad
The bright sky is dark and gloom,
red hibiscus never will bloom.
Below flags fluttering half mast on your honor.
Your bright eyes in upper layer
looking down below, saying,
"Do not cry, a day will come , we will meet again".

Know this, this cycle,
this short departures, this reunion
will revolve in a circle to
infinity until this sphere crumbles.

Today the whole world is sad.
World was sad before and will be sad again
But we know, no matter who we are, we are all related
one way or other only our DNA is diluted.
Today I am sad for you, the whole world is sad for you.
We are all related, know that for sure.

Memories Ever-Alive

Indrani Mondal

We were very different right from the start. In fact we were poles apart or maybe just generations. Our ways of looking at things, people and the world, were often at loggerheads. But we also had many of the same loves love of art, home décor, varied cuisines, cooking and of course books. We both unequivocally loved reading and enjoyed expressing our thoughts and feelings in words. Or rather I inherited this love of literature from her. That is why my late Mother kept a journal which I discovered in the last drawer of her bedside table where she had last slept. As I opened the brown diary I found a pair of flying sea gulls sketched in an angle on the time-colored and age-frail first page, with the beautiful calligraphic words "The Flight" as the title. There was a subtitle also, "My Gleanings from the Book of Life" with a quote below it, "It is better to kindle a light than to curse the darkness' (Confucius). Her handwriting was as neat, well formed and upright as her person.

I was my parents' only child who moved far away to a different country and small as the world has now become, our distance in philosophies and geography were never really bridged. Be that as it may, I couldn't help regretting that I was unable to watch over my parents as they grew old and turned to lived memories, instead of helping them make and live new ones. As I say these words though, I am fully aware, how strong and willful my Mother was, never one for following or doing anything unless she herself believed in it. But I have to admit this to her credit and grit, that for better or worse, she was never averse to taking her stand even on thorny issues, facing the consequences of her actions and decisions, holding true to her independence of spirit and lifestyle till the very end. Her infinite perseverance and unflinching courage in dealing with one's own world views and outlook, whatever the odds, were frustrating for me at times but that never stopped me from admiring her tenacity, resilience and steadfastness.

Her wit, words and inordinate memory at quoting poems from Shelley (her favorite poet), Keats, Byron, Tennyson and Shakespeare at the most appropriate situations, are some of the most precious memories of my childhood and early youth. Born in East Bengal (now Bangladesh), raised in Trichurapalli in South India and Delhi in the North, my mother had been married young to a tall, fun loving, music minded, England returned West Bengali engineer, after a chance meeting at the Jamshedpur Railway Officers' Club (I spent the first six years of my life in an idyllic and sprawling Jamshedpur bungalow) and completed her graduation with an Honors in English literature in the first coed batch from a prestigious Kolkata college. Her exposure to various customs and ways of life not only enriched her observations and often brought spice and bite to her feisty remarks, but they also made her a versatile, efficient, prudent and caring person. As my dear departed father used to say, her varied experiences to an extent gave her the right to be opinionated and ingrained in her beliefs. A rich, complex personality with many contradictory layers, my Mother was the most colorful, interesting, entertaining, versatile and altogether smart person I have ever known. Her ever curious, intelligent mind kept her ever youthful till the very end. In my last phone conversation with her she had told me to enjoy my husband's conference cum vacation trip and relate to her all the little fun details and natural description of the place right after our return. Needless to say that never happened. But because she was so special to me, I feel compelled to share some of her writings from her journal with my community today. I have chosen the first and the last sections because when reading, I was impressed by her direct and frank narration from first to last.

The Flight

My Gleanings from the Book of Life

By Bella Ganguly

"It is Better to Kindle a light, than to Curse the darkness"- (Confucius)

Prologue

Life is undoubtedly 'a tale told by an idiot, full of

sound and fury, signifying nothing!' And yet how conceited is man! His constant endeavor is to make himself immortal in more ways than one. It is perhaps this same desire that made the seers of old overcome the inevitable death of the body by distinguishing a soul which they averred, immortal.

I too, being no more or less, than a human being, it is perhaps this self same feeling that has urged me to narrate my tryst with destiny, in the hope that the lessons that life has taught me may perpetuate a message in some sensitive mind. So I write with much humility and thanksgiving, always keeping faith in my quest for all that is, I believe, truly good and beautiful in Life.

Down the memory lane,
through the mists of time

With the first vibrant note of the awakening of consciousness, I remember myself as a small, carefree child playing in the pretty gardens of a sprawling railway officer's bungalow in far off Golden Rock, a railway colony in Tirichurapalli, Tamil Nadu, South India. The name of the place was however spelt differently then because of the British Raj. It was called Trichinopoly, in Madras Presidency.

Our railway colony had the alluring name of Golden Rock because slap in the middle of the surrounding plains there stood strangely, one big hill. It was very difficult to climb to the peak of this rock or hill. The irregular steps cut into the front rock face that went up to the middle of the huge rock where there was a big, yawning, dark cave. On the other side we could climb about twenty well cut steps and find ourselves in a cool dark temple. The front of the temple was a flat plateau like structure paved with smooth rock slabs. Although I was a 'tomboy or 'gecho meye', as my mother liked to call me and I spent many a quiet holiday afternoon clambering on the rock face, I cannot remember what deity was worshipped there. But I do remember my mother had sent special offerings to that deity after my younger sister and I recovered from a prolonged attack of chicken pox because unbeknown to my mother or sisters, the priest there had given me a generous helping of the delicious sweets my mother had sent for the puja.

There were many stories prevalent among the local people about the origin of the name 'Golden Rock'. Some said that in years before, when the British had first come to rule India, there were independent states ruled by Rajas all around here. The British looted these rich kings of the area. At such a critical time of the British attack, when they were mercilessly ransacking lands in his kingdom, the Raja of a neighboring state, Pudukothai, had stored all the gold from his treasury in that huge cave in the rock. Hence the name became Golden Rock. But my several adventure trips to the cave, when my mother and house maids were asleep on warm summer afternoons, always ended in disappointment for I never found even a single paisa there.

Others held that when the first rays of the rising sun touched the rock, it shimmered like gold, hence the name. This reminded me of the origin of the name of the Kanchanjangha (Golden Peak) range in the Northern Himalayas, though here it was on a much more modest scale. Much as I liked this version, the reason, to my young mind, was quite simple. It was because the color of the soil on this hill was a much lighter brown than the dark soil with green vegetation surrounding it. The hill attracted a lot of attention as it was the only high land in the middle of a flat landscape. Golden Rock is now called 'Ponmallai', 'Pon' means gold and 'mallai' means rock in the local Tamil dialect.

Our railway colony surrounding Golden Rock was quite neatly laid out. The nucleus of this town was the railway workshop or manufacturing plant as they call it now. Near the workshop were the small neatly fenced quarters of the subordinate railway staff. A little away from them and separated too, were the 'H' type quarters of the supervisory staff. These were modest, comfortable and moderately big houses. Near these quarters was the railway school run by nuns of the main St. Joseph's School where my sisters and I used to study. There was a big Church that stood at the focal intersecting point of the four main streets. Near these quarters were also situated the very few shops of the colony. They mainly sold eatables. There was no permanent market place in the colony in those days. An open field nearby served the purpose for the weekly Sunday market which was called 'Shandy'. The main reason I remember these details and like to recount them is because I learnt to appreciate the systematic arrangement of my childhood colony with quiet, neat roads, for it was very different from what I saw in later years in crowded North India.

The officers' quarters where we lived were situated near the entrance to the colony more towards

the town of Trichinopoly. The officers' quarters were huge and sprawling compared to the flats of today. They were red bricked with irregular grey cement on the walls, trellises with creeping ivy along long, cool, verandahs, porticos with rolled, moist, fragrant khuskhus blinds, surrounded with big gardens. I think my liking for large open spaces and grand interiors started with my childhood abode. The houses occupied by the British officers could immediately be recognized because of the well kept gardens, in contrast to the moderately maintained grounds of Indian officers like our family. I overheard my parents lament about this often to their friends and say how many good things we had to learn from the British instead of the bad, but was rather surprised to find that nothing was done to change the situation either, other than my mother's weekly sessions with our gardener or maali regarding which flowers were to be planted or removed. I suppose I did not understand at that young age that however far we maybe from Bengal, we are after all Bengalis, who love to talk, more than to act.

Near these quarters was a small park. It had plants of all kinds that were colorful and bright. There was a riot of orange, purple, yellow and white flowers that were small and resembled star clusters, with the additional beauty of being very fragrant. The park had two swings and often, in later years, when we had to walk to the railway station to go to school, I wouldn't miss a chance to steal a couple of swings in the park, as my more prim and proper sisters trudged on ahead. Nearby was the railway station and can you guess what the name was? Yes, it was called Golden Rock, of course. Maybe because of this I remember my childhood years also as 'Golden'.

On the way to the station was a small but exclusive Officers' Club, at first patronized by British officers only, but later on, as independence approached and after 1947, also by north Indian officers and their wives. The south Indian officers were thought to be more conservative and retiring. My parents were north Indians but were the only Bengalis there. For that reason they neither mingled too much with the locals or the other Indians but kept mostly to themselves and their close neighbors and the socializing that my father's professional rank and position required.

Our colony was connected to the town of Trichinopoly by a high metalled avenue. It formed a lovely vista with tall rain trees and yellow flowering shrubs forming a beautiful green, shady, leafy canopy from one end of the road to the other. The road was raised from the surrounding low lying areas where monsoon waters would collect. It acted as a natural 'Bundh' or dam so that the rain waters did not flood the surrounding lowlands. This road was called, yes you guessed right again, Bundh road. At the colony end of this road, stood a sentry, guarding the entrance to the railway colony. At the other far end of this road, near the crossing of the main road to the town, on a land a little raised from the surrounding low areas, huddled the shacks of the local workers. Most of them had converted to Christianity. Their women worked as 'ayahs' or baby sitters of the officers' children including us. I learnt at a young age from my ayah, an energetic and caring middle aged woman, named Rosy, that they were the so called 'outcasts' or 'untouchables' in our Hindu religion but had found refuge in Christianity. For that religion gave them a means to scrape out a semblance of human dignity in the holiness and catholicity of the teachings of Christ. I believe my own questioning of elaborate Hindu rituals and regular idol worship had its seed laid then.

I was unquestioningly my father's daughter. My first memory of him is as a smart, young railway officer very unlike in looks and demeanor to anyone else we saw at our colony. My father hailed from an aristocratic Zaminder family of Bhola, a bay island, in East Bengal, now Bangladesh. He was posted as the Chief Engineer of the Planning department of the "Golden Rock Workshop' of the South Indian Railways. Sharp in looks and brains, he was the only Indian officer who at the young age of thirty two held such a key post with all the other British officers. Many are the stories of how my father courageously defied British officers who rode roughshod over the Indians. But let it be said to the merit of the British, that they never failed to appreciate my father's merit, integrity and fire and showered him with laurels professionally and socially. That is why our Golden Rock years were indeed 'golden', for we learnt that uprightness of character and application can never go unappreciated. The sad truth is that in later years, I saw this belief of mine being assailed time and again but I have to thank my dear father for giving me the strength to believe in oneself, be what may. Indeed through his own actions he had taught us the importance of being unflinchingly true to ourselves and never compromising for petty convenience.

My mother was a true Bengali housewife. She came from a lawyer family of Madaripur, also a subdivision of Faridpur district in east Bengal. She was an excellent cook and seamstress. Coming from a large family herself, she knew how to quickly settle our sisterly feuds, but not too often to my liking. Though both my parents came from Bangladesh and from large joint families, they had different tastes, outlook and mannerisms. To my chagrin often times, my mother refused to spend time and energy in socializing or home decorations (both of which, my father and we sisters enjoyed) but devoted most of her spare time to cooking and clothes and kantha stitching (which is really considered an art today). I later realized how prudent and efficient that made her in family financial planning, and I tried hard to follow her example many times in my own family matters. Also it is from her that we learnt some of the most delectable Bengali food preparations I have ever tasted. Although her own mother, my Dimma, had insisted on sending a local Bangladeshi cook, Madhu, with her daughter, (my mother), when my father got his south India job posting, my mother oversaw all the household cooking herself. We knew all the Bangla pithas, aachars, and sweetmeats and of course fish (although with only the local fish, no Hilsa or Pabda in South India) and vegetable preparations, because of my mother's meticulous observance of authentic Bengali food practices in our home at all times. My acquaintance with Dosas, Idlis and other South Indian delicacies usually was at my friends' homes or from their lunch boxes in school.

Along with Madhu, our cook, we also had another house helper, Santosh. He worked with us for sometime before he joined the army during World War II, because it was more lucrative to be a soldier then. I remember my mother trying to dissuade him for Santosh's mother came to us in tears as he was her eldest child and she didn't want him to leave. All our hired helpers were like our extended family members. They ate the same meals as we did and often confided their family problems to my mother and sought her advice and monetary help. My mother always watched over their needs as best she could without being overly indulgent. When sending Santosh to the market on Sundays, she always made sure that favorites of all under our roof were equally provided for. At the same time she maintained her distance as the unequivocal mistress of our household. I always took her vigilance for granted and sometimes also complained about her over-attentiveness to us all, family members and outsiders. But as I grew up and moved away from home, I realized how right minded both my parents were. In our home we were all treated with uniform care and attention but my mother was never over familiar with any of us. Try as I might, I have never been able to imbibe her uncanny balance of care and distance.

All our helpers used to live in their very own quarters provided only for them. This was a large bungalow situated at the back of our house, in the corner of the sprawling garden. The only exception was our gardener or 'maali'. This maali was a local Tamilian. He belonged to the 'kalhar' caste 'from which all the maalis in that area usually hailed. Kalhar actually means 'thief'. As these maalis were also our house watchmen (durwans, as they were later called) it was the practice of the railway officers to employ them from the 'kalhar' caste in order to 'set a thief to catch a thief' and thereby protect their households from burglary. Our maali's wife was our house maid, cleaning utensils and being my mother's handy help in our household. Though they lived in the same house as the rest of our household helper staff, the maali actually spent his nights on our verandah. He had a tightly stretched choir cot, a wooden pillow, used by the local people to safeguard their backs and a kantha, hand stitched by my mother, in one corner of our long rambling verandah. Here he slept with a long, thick, wooden stick by his side. The stick was armament enough against intruders in those days, when life was not so complex.

We being North Indians and the only permanently posted Bengali family there, we sisters were well known and loved as the three Chakrabutty daughters. However we sisters were all very different from each other in looks and nature. My eldest sister was very good looking and a good talker. My younger sister was tall, very fair, and always giggly and didn't seem to be related to us in appearance or manners. I, the middle one, was the shortest, darkest and plainest of all and, in my heart of hearts, always felt sad because of it. But, as my parents, especially my father, never failed to tell me after every school examination result, I was the smartest and most talented of all their children. It was their constant pride and joy in my achievements that gave me the confidence I have today. Our only brother was born much later just before India's independence. He was so much younger than us that he quickly became very dear to us as more than a

brother, for we, all three sisters, helped bring him up as our baby.

Our mother had been brought up in far off Bangladesh and was never fluent in English. So she had a keen desire to educate us in an exclusive English medium school. Another practical consideration, that she later told us, was that all the local colony schools had Tamil as their medium and she had never wanted us to spend the rest of our lives in Golden Rock, south India. So, first our eldest sister Nellie and later my younger sister Meena and I started our schooling in the reputed St. Joseph's Convent and European Girls' High School in Trichinopoly. We sisters started going to school regularly and merrily at first in the convent car and then, during the patrol rationing days of the second World War, by train and later by foot. We had no need to see the clock to leave for school every morning. The Boat Mail, (so called because it connected passengers from Madras to the boat that crossed the Palk Strait to Colombo) would thunder past exactly at eight o'clock and we could see from our verandah, across the vast expanse of open land in front of our house, the sleek, black, train puffing along.

The days rolled by happily for us children in our cool and spacious home with its extensive gardens, green carpeted lawns and beautiful flowering bushes and tall trees. I was always up with the dawn and loved to walk about barefoot on the dewy grass as it tickled my foot and I inhaled the fresh air of the morn as I revised my lessons for the day ahead at school. My love of Nature began then and stayed with me always. After the day's meaningful studies at school, we sisters would return home around four thirty pm in the afternoon to a well laid out table. As I said before, my mother was an excellent cook and her home-made Bengali delicacies (none of these were available in the local markets there) of Sujir Payesh, Burdwan Khaja, Dhakai paratha, Rasgulla, Gulap jamun, sweet Bundi , Samosa, Nimki ,Khasta Kachuri, Fish Kabiraji etc. set our taste buds to be connoisseurs of authentic Bengali jalojog.

Our School was a simple but imposing grey building with a quiet chapel by the entrance. It had a life like statue of crucified Christ with red colored stone chips showing blood, dripping from the thorns round his head. Whenever I passed this statue I couldn't help being deeply disturbed and prayed that we should never inflict such dreadful pain on others. At the far back corner of the chapel was a beautifully carved, wooden, antique grand piano which the Sisters often played to accompany afternoon Nun's Choir. Many a lunch break have I passed sitting in the chapel and listening to the soft and soulful tunes sung by our dear nuns. I had requested my mother to give me permission to learn the piano from one of the nuns at our school, but my parents decided that our Western influence should not be extended thus far. So I had to start learning the sitar (which I grew to like much later) and my other sisters started learning classical Carnatic vocal music (but soon gave up due to lack of regular practice time). In later years I think I made up for my desire to play the piano by teaching my daughter this instrument. When she moved away from our house I used to miss the sultry evenings, when during the long loading shedding hours, she would in the candle light, practice on her piano simple pieces from Beethoven, Mozart or Chopin. They would bring back to me a feel of some of my golden childhood memories. In the garden near our school play ground there was also a neat little grotto. Here a statue of Virgin Mary with the infant Jesus in her arms moved me deeply. This was a favorite haunt of mine for I was intensely attracted by the holiness and purity of this serene nook, away from the hustle and bustle of the rest of the school.

I truly admired and revered the French nuns, my teachers. The very fact that they were able to keep on their long, flowing attire and head cover in a hot and humid country so unlike their own and were here only to help educate us, impressed me. I often saw them wiping their sweat in small hand towels they carried in their gown pockets. Their perseverance, dedication and unquestioning commitment to teaching made me respect them and I felt sad for them, thinking they had no parents waiting for them when they went home in the evenings. I particularly liked Sister Henrietta and Sister Gallyot who influenced me with their sweet, encouraging words. They always assisted me when I couldn't understand any class work or home task. Sister Henrietta constantly advised me to continue my studies even after school and never to give up writing. A holy picture given as a gift by her as I was entering the hall of my Senior Cambridge exam with her blessings inscribed on it, still stands on my bedside table. I showed it to my daughter when she was going through a very trying time in her life and I do believe she was wiser for it. It said, “Our trust in the Good Lord, so Powerful and Merciful, is never too great. The measure of our success is that of our trust in Him.” I firmly believe that all that is good and pure in my

personality, however small, every success in my life, however little, is due entirely to their shining example and all that they have taught me. My respectful regards reach out to them even today.

What with my schooling and nurturing home life, my homely mother an excellent cook and housewife and my efficient, honest and meritorious father giving us their own brand of warmth and protection, my carefree childhood far from the madding crowd, was as precious and beautiful as the dewdrops on the petals of the Kanakambaram (golden orange flower native to south India) flowers in our garden, luminous in the morning sun's rays. My inspiration to write came from them all. But like dewdrops they soon melted away.

After my Senior Cambridge examination, which I passed with flying colors, my father was promoted to the prestigious rank of Joint Director Railway Board of India and was posted in Delhi. Our untarnished days at Golden Rock ended and we moved to the capital. Though everyone thought we were really lucky, I was both happy and sad, for though I was looking forward to study in Miranda House, a famous girls' college in Delhi, I knew I would sadly miss the dear nuns of St. Joseph Convent School who would always hold a lighted torch in my heart.

The concluding chapter of my mother's journal

I am happy to say that though my daughter lived far away from the home where she grew up, over the years many of her friends from Chicago have visited Mr. Ganguly and me. When I meet them she doesn't seem very far away any more nor do I feel so alone. I found out quite by chance that one of her friend's mother was Mrs. Bhabani Sanyal, whose songs I had enjoyed on TV. What a coincidence! Since both Mrs. Sanyal and I were caring for our aging husbands, we didn't have the good fortunate of meeting in person. But we talked on the phone several times. Hearing my Bangla interspersed with English several times, (I've always been embarrassed about this especially after we settled in Bengal) she requested me to translate some of her beautiful Bengali songs in English. I hesitated, not being very well versed in the intricacies of Bengali language and idiom, but she insisted and today I'm glad I agreed. I think these verses express the sentiment of all artistic people everywhere, as they come to understand that they are not physically young anymore. I had the good fortune of reading out my translations and critical appreciation of her verses and songs to Mrs. Sanyal on the phone, and she said that she would copy them out on the other end. Later she thanked me and said she liked my thoughts and promised she would share my words with her friends.

I think today, a year or so after my husband passed away, my translations are very important to show what my thoughts have been recently and so I have kept them in the back pocket of this journal for whoever wishes to see them, maybe my daughter.

Songs by Bhabani Sanyal, trans-creation and critical appreciation in English by Bella Ganguly

"Ekhono phere ni ghare anek pakhi,
ekhono rajani hote kichu je baki....."

This song melodiously expresses a homeward bound flight of birds, finding an answering echo in the 'homeward bound' soul of the singer. As evening comes, the shadows lengthen in our lives, the time for work ends and we must get ready for going home. This is nothing but a metaphor for growing old. But in spite of this, the singer bravely says she has still more to do, more to give and the darkness of Life's night, is yet to come. It reminds me of a poem I used to quote for my daughter when she was young and she later had to study it for her class x English literature. It is Robert Frost's famous lines,' the woods are lovely, dark and deep/ but I have promises to keep/ and miles to go before I sleep/and miles to go before I sleep…..'

"Jakhon ami thakbo na eikhane /
amare rakhio mane amar ei gaane...."

It is an aching feeling for every mortal being that we are here in this world only for a short while and once departed may never return, hence the quiet sob and prayer in this song, "When I am gone, forget the singer if you will, but not the song." In short, 'Remember me, the best is yet to be'…….

"Oi neel akash sabi tomar /
ei sabuj dhora sabi amar…"

The transience of life becomes all the more real in the sunset years of life. Hence the natural desire of the aging singer to hold on to something precious, to possess, and to belong. It is as if a mortal human being is talking to Almighty God, 'If you have the Heavens and the sky, the elevated and the vast, I too have this beautiful Earth to live on, play in and love as my very own refuge' a mind game of give and take, if you will.

"Ke asi dakile amai ei bhara barashar khane ..."

Ever since Tagore's songs have become an intrinsic part of Bengali culture and thought, spiritualism and romanticism have been woven together, as in this song. Although I would prefer to keep them separate, this tuneful song is very nostalgic. The strains remind me of the old world Puratani songs of Bengal, sonorously rendered by my late father-in-law in his Varanasi Harisabha by the Ganga where we visited him every winter.

"Swarga jadi namiya ashito amar kache /
Dekhiya nitam sethai kato sukh je aache ...."

From ages gone by, man has had visions of Paradise. That is why every religion has its own interpretation of Paradise. It is said that our very own Taj Mahal, was designed on the Sufi concept of Paradise. But the Paradise we all seek is in the mind of man or in our own hearts. Hence here the singer wants to see Paradise not on the other side of the divide, but here, while yet alive, so that she can live and enjoy in a Heaven on earth. So it is interesting to note that the singer's background belief is that such a Heaven on earth is possible after all.

"Kakhon tumi ashbe bole duar khule raakhi/amar sakal kaaj je takhon roye jai baaki/

andhokare tarader apni alo jale/tomar to tader moto mon nahi gole...."

The stars glimmer in the far away darkness. But, dear Lord, do your love and blessings come down to me like the gentle star light? In this song we hear the yearning of a lonesome soul for the warmth and soothing touch of companionship or friendship, without which all life's labors are meaningless, purposeless and unfulfilled. Once again Lover, Friend, Lord are one.

In conclusion-- throughout these songs, there is the cry of a lonely heart endeavoring to reach out and be appreciated by kindred souls. It is heartening to see even women of yesteryears, like Bhabani Sanyal, come out of their hitherto cloistered lives, spread out their wings, savor the joys of living, and sing their own soulful songs with full throated ease (I am reminded of Shelley's 'Skylark' pouring out its melodious song as the skies darken).

Mrs. Bhabani Sanyal takes a bow from Mrs. Bella Ganguly of Ballygunge Kolkata.

***

After this final writing, my mother's journal was filled with details of how her personal belongings should be taken care of by me with an awesome matter of fact precision. It was as if she knew her days were numbered, and wanted whoever came after, to be able to handle things without any hassle. Her easy back and forth between her love of literature and her efficient housewifely instincts amazed me. Indeed, her smart, caring ways stayed with her to the very end.

When I visited Kolkata for my mother's funeral this last summer, I had read her journal strolling on the upstairs terrace of our Ballygunge home, where we had often debated about serious life issues in my adolescence and early youth years. It was a warm, sticky monsoon afternoon. The fragrance of the Kamini tree, she had planted in our back courtyard, wafted up and seemed to stand still in the heavy, humid air, like her hand on my forehead, her hand that I had not been able to hold when she had breathed her last. I knew then that she was very much there and with her uncanny intelligence was trying to tell me, that she would always be there for me. As I reached the final pages of her 'Flight', and read through her beautiful prose, I couldn't help being 'sad and happy at the same time', to quote a line from her own journal. Sad, because I would never again be in the presence of that unique blend of down to earth practicality and profound creative sentiment that was in my Mother; happy, that she had endowed me with her intrinsic wealth of being creative and appreciating creativity, which I could share and pass on without any fear of loss.

Editor's note: To give the readers a flavor of Mrs. Bella Ganguly's unique voice, the text alterations were kept to a minimum.

QUIZ by Basanti Banerji

1. **Ans. A, B and D. Cardamom**.

   The Indian name Elaichi has a Dravidian root , the Latin word Cardamom is derived from a Greek word.

2. **Ans. All. Poppy seeds** from Poppy flower plant.

3. **Ans. A and B. Lotus** . It has been studied in Australia. Lotus also has a rare ability to survive and revive into activity after stasis over thousand years.

   It is the national flower of India and Vietnam. National flower of Republic of China is Peony.

   The stalk can be as high as 150 meters and higher.

4. **Ans. A and C**. **Jackfruit or Kathal.**

   The English word Jackfruit comes from Portuguese *jaca.* Its wood is used to make musical instruments and furniture. Also a dye made from the wood is used color the robes for Buddhist monks in Southeast Asia.

   It is national fruit of Bangladesh. National fruit of India is Mango.

   Proverb is echhore paakaa. Another proverb porer maathaa-y kathal bhanga

5. **Ans. A, B and C. Bitter melon**.

   It is known for its bitter taste, has a helpful effect in controlling Diabetes Mellitus.

   It is increasingly used in Japan for the health benefit.

(Source: wikipedia)

Motifs of a Summer Evening

Juthika Basu

The raging sun went rampant with its bloody streaks
And all through the village spread an eerie glow
The squawking geese crashed into the azure pond
And fashioned a pretty spectacular water-show

The lonely egret walked stealthily towards his prey
Keeping amidst the dry burnt umber cat tails
Stalking the glittering fish as it tried to swim away
Just below the clear surface of the sparkling waves

Amidst specks of gold and tangled green weeds
The silvery fish danced till it no longer could
The egret eyed and tracked the poor creature
Swooping downwards from where he stood

In one fell swoop he had pinned his victim
Dipped his head and between his beak
The length of silvery bass struggled to be free
I yearned to be like him so I took a quick peak

As the bass stopped its fight and lay like a rag
Still between the beak of the crafty bird
I wished my fishing rod could do some tricks
And pick up fish when something else stirred

A row of young beavers cuddly and sweet
Were headed towards a dam they had built
The water lapped gently as they pulled ahead
By now the sky looked like a woven quilt

The colors came in purple and dusky pink
The sky turned a deeper blue as if to hide
The stress of the day to stay pale and clear
Under the sun but now it could subside

Into the tranquility of the night and soft twilight
Peace and quiet; only the crickets buzzing
The navy blue canopy had some twinkling stars
Time to retire and back to the daily trudging.

Mia, the Fussy Eater

Janice Das

Mia did not want to eat her dinner. "Yucky!" she exclaimed.

"Okay," said her mother. "Maybe tomorrow you will like it."

"No way!" pouted Mia. This was the usual conversation at mealtimes. Mia simply disliked almost all food that was put in front of her. It was either too this or too thattoo slippery or too bumpy or too crunchy or too mushy. It was always "too something."

She put her pajamas on and her parents tucked her into bed.

"You know," said her father, "We happen to have enough to eat here in America. There are a lot of children in other countries, like India, who would love a full plate of food for supper."

"Why?" asked Mia. "Don't they get supper like I do? Even if they did, I bet they'd hate it."

"Well, lots of families can barely afford to eat one meal a day, so the children gobble up whatever is on their plates."

"They can have mine, then, "said Mia. "Who likes Brussel sprouts?"

Mia fell asleep. When she woke up, she realized it was because she was getting bitten by mosquitoes. Her bed felt different, too. The mattress was very thin and the bed was closer to the ground. When she looked around, nothing was familiar to her. And another little girl about the same age was sleeping next to her.

"Oh no," she said to herself, suddenly getting frightened, "I must have landed in one of those other countries my dad was telling me about. How do I get back to my own house? And who are these people?"

She was in a one room hut. It was hot and sticky but in spite of the heat, she was hungry from not having eaten much the night before. Just outside the hut, a lady was squatting in front of a little fire, holding with tongs something that looked like flat bread.

"Who are you?" called out Mia. The lady turned around quickly at the unfamiliar voice, surprised to see a strange little white girl sleeping next to her daughter. But then she smiled and said something. Mia could not understand her and started to cry. The girl next to her woke up, startled to be sharing her bed with an unknown person, but when she saw Mia crying, she tried to comfort her.

"Please, I just want to go home," sobbed Mia. Soma, the little girl, jumped out of bed and ran to her mother, who was frying chapattis. "*Ma, kikorboamra?E meyebanglabuste pare na.* Mother, what shall we do? The girl doesn't understand Bengali."

"We will have to teach her. I do not know how she came to be in your bed. She is obviously from somewhere else, a *feringhi,* a foreigner. But no matter right now. First, let us see if she wants to eat anything."

Soma made the motion to Mia of eating, saying "*Kichhukhabey*?" Mia nodded. But when she took a bite of the leathery flat bread, she spat it out.

"This is just as bad as the Brussel sprouts I refused last night at home! What am I going to do?"

In Indian villages even seven-year-old girls need to work around the house because there is always a lot to be done, before and after school, and this village, just outside Kolkata, was no exception. Soma showed Mia how to wash clothes at the little stream by scrubbing them and then beating them on the rocks. She showed her how to sweep the dirt floor, put more dirt on it, and pack it down firmly. They fetched water from the stream in pails, and Mia learned to boil it. Ma taught her how to boil rice and cook *dal,* or lentils.

By that time, Mia's stomach was growling from hunger. She pointed to a leftover chapatti that was about to be thrown to one of the dogs who lived outside the hut, indicating that she wanted to eat it.

"I will give you some of the dal you helped me make, to go with the chapatti," said Ma.

Mia took the plate gratefully, eating it all with her fingers, as she had seen Soma and her mother do. Never had anything tasted so delicious to her.

She grew used to the village way of life, getting up at dawn, fetching water, cooking, washing clothes along with Soma, and attending the outdoor school, where all the children sat in orderly rows on the ground, slates in hand. At first she had no idea what the teacher or the children were saying, but she learned quickly and was soon speaking Bengali, the language of the area. When the teacher realized she was from America, he asked her if she would like to teach the other children some English words and expressions. Mia's daily lessons became everyone's favorite part of the school day. Laughing, the boys and girls repeated after her: "My name is Alok (or Sunil or Benu or Meena). What is your name? Where do you live?" She taught them the names of all the objects around them, and in turn, they told her the Bengali words.

By the time she and Soma finished their afternoon chores of washing and scrubbing the pots and plates and taking down the clothes that had been hanging outside to dry, she was looking forward to anything that got put on her plate. Usually it was a chapatti and dal, but occasionally Ma would add some vegetable, such as peas or green beans or potato.

"*E khaowa amar khub bhalo legechheey.* This is the best food I ever tasted!" Mia would always tell her, and Ma would beam back at her.

Each night she and Soma would whisper together about the day's events. They became best friends, and the days slipped by quickly, turning into months.

One morning, just before she got up, Mia sensed a difference in the bed. It was no longer the thin mattress on the charpoy she had gotten used to the last several months; it felt suddenly softer and thicker. She was back in her own bed in America.

She jumped out of bed and ran to her parents' bedroom.

"Mom, Dad! I'm back! You must have been worried like crazy about me all this time. I just spent a long time in an Indian village. And guess what the food was wonderful! We ate mostly chapattis and dal, but boy, did it taste good!"

Her parents looked at her and then at each other. They both spoke at the same time.

"But Mia, we just put you to bed last night, and it's the next morning. You couldn't have gone to a different country, but if you did, it was only overnight. That must have been some dream you had."

"Uh-uh," said Mia. "That was no dream. I lived with Soma and her Ma and went to school there and I even taught the other kids English. And Soma taught me Bengali. See, *ekhon ami bangla boltey pari*!"

Mia's parents stared at her. "I guess we'll just have to take your word for it," they said, totally bewildered.

And at dinner that night, when Mia ate everything on her plate, including food she had never seen before, her parents knew something very special had happened to her the previous night. Whatever it was, they weren't going to question it any further. Mia was no longer a fussy eater.

Life Remembered

Kakali Dasgupta

"Here we are, I'm sure you'll like this," the realtor says as he unlocks the front door and steps aside. Eager to get out of the unforgiving Florida sun, we quickly walk into the ranch style house, one of the many cookie-cutter houses that line the street in this retirement community in central Florida. The afternoon sunshine lies across the pickled maple floor in a lazy, hazy swirl of light and shade. Both of us, my husband and I, stop short in amazement. This is not a run of the mill rental, filled with Ikea-like non-descript furniture. We have stepped into a lovingly decorated home, filled with the precious memories of the previous owners. We feel as though we are trespassing on somebody's serene space and at any moment the owners will be back.

Bill, our realtor, reads our minds — "These were an older couple and when they passed, the inheritors did not even come out here. They sold the house with all the contents. You should have seen the coin collection; the children did not even want that."

I look at the elegant furnishings, the exquisite Japanese ceramic collection, at the backyard with a small prayer lamp and look at my husband. We both know that we will rent this house.

To give a little background, my husband and I were short-term transplants from the Midwest, looking for a furnished place to call home over the next year or so. When the realtor drove us up to this gated community, we were pleasantly surprised. Bill took us on a scenic tour of this beautifully manicured golf community. It seemed as though we had stepped into different world the minute the gates of the guard house closed behind us. Outside lay fields of dried grass, barren and fallow except for some hardy shrubs and bushes. Inside was a luscious and verdant paradise of orange trees and flowering shrubs set amidst gentle rolling hills, lying snugly in the embrace of a championship golf course.

The realtor, who also lived here, took us around with as much pride as a parent showing off his newborn. The clubhouse, the tennis courts, the activity center with its upscale spa, the exercise room with the latest equipment, the two Olympic-size pools with heated Jacuzzi — here were all the accoutrements of privileged living. Bill handed me the calendar of activities — yoga, Pilates, Zumba, line dancing — all available to those who lived here. These were truly the golden years of pampered living, meant to entice all retirees willing and able. By the time Bill showed us the house we were already sold on living here.

Bill tells us we can move in the next day and that's what we do.

The next few days were filled with amazing discoveries. I find a collection of Japanese figurines which are so wonderfully crafted that at any moment they could come alive with a swish of their kimonos. I open a china cabinet to find a collection of Lenox limited series gold-bordered dinnerware, stemware imported from Italy, mementos from the world over. These were well-traveled folks, suave and worldly, who lived life with gusto. In the garage I find his engineering diploma from the University of Colorado, class of 1939. In the master bedroom, I find her embroidery basket, the spools of thread still bright and shiny, neatly organized in color schemes. The bathroom holds an unpleasant surprise — expired medicine bottles that I quickly shove into a plastic bag. In one of the bathroom cabinets is a sketch of a bathing nude, signed and dated Paris 1948. A memento perhaps from their honeymoon in Paris?

My cousin and her family visit us for a couple of days over Christmas, on their way back from Orlando. The minute she steps in she finds the place very upsetting. Along with her two daughters she goes through closets and cabinets, filled with the guilty pleasure of rifling through somebody else's things. Every once in a while, I hear the refrain from them — "Ohh, I don't know how you can NOT be scared!" I smile to myself — scared of these folks? He grew roses — look at the collection of books on roses. She loved to embroider and they both loved to travel and entertain friends. The collection of cookbooks and the

wineglasses bear out that presumption. Here is a whimsical figurine of a French chef in the kitchen, a cookbook holder, ready to help your culinary efforts with an encouraging wink. They picked it up from a quaint, ivy covered store in a small village in Provence. They went on golfing tours and fishing trips. One year they went to see fall colors in Vermont — the two mugs they picked up there say so. These were lives well-lived but they also gave me pause.

All the stuff we gather around us and cherish all our lives, will this be their fate too? To be picked over by strangers who have no idea of the stories behind this vase here or that painting there? My sons assure me, tongue in cheek — "Don't worry Ma — we will fight tooth and nail over all your stuff."

Before long, our time in Florida comes to an end. The day we leave, we close the door behind us with much sadness. The Paulings, whom we never met, taught us this invaluable lesson — live well, be happy and minimize your belongings. Maybe that would be one of the greatest gifts we could leave behind for our loved ones.

Travels through Karnataka

Paroma Banerjee

Indian hospitality greeted me as soon as I landed in the Bengaluru airport with my friend's parents picking up at 3am after a 45 minute delay without a word of complaint. After a jetlag recovery snooze I was greeted with homemade Dosas and easy conversation with my friend's mother as though she were my own (biological) aunt. When I describe travel to India, sensory overload is a phrase always used. Even staying in a quiet neighborhood in Bangalore, the perpetual chanting, ringing temple bells and friendly chatter are reminders of the rarity of silence in city life.

I watched my friend's mother cook simple, healthy and filling vegetarian cuisine, using the same stainless steel to both cook, store and serve using the same dishes while using solar heated water. While I marveled over the joys of simplicity, the irony of extensive sari shopping soon after my arrival was not lost on me.

Taking an overnight train to Humpi on the largest train system in the world made for impeccable people-watching with nearly anyone being able to afford travel. Sadhus, families, tourists lingered with the sound of chai-wallas hawking tea and Dhol players in action. Even in the relatively sober South there is always a reason to celebrate! Entering Hampi was breathtaking with buildings peeking out of massive boulders in a surreal landscape. This capital city of the Vijayanagara Empire was declared a UNESCO World Heritage site in 1986, yet repeat visitors still make new discoveries.

The Vittala temple complex with the famous stone chariot was perhaps my favorite. A set of monolithic pillars doubled as a giant musical instrument once upon a time, with each column tuned to different pitches. Detailed sculpture reliefs reflected the cosmopolitan life of this trade center with Persians, Mongolians and multiple Vishnu avatars, including Jesus. Other temples included entire depictions of the Ramayana with each carving being unique, including optical illusions. Days could be spent at only one temple exploring the detail and stories. This well planned city included an advanced irrigation system, with dirty pool water irrigating fields creating a massive gray water system.

Our visit coincided with a festival celebrating the engagement of Shiva and Parvati in the Virupaksha Temple. Pilgrims, vendors and monkeys crammed into the last functioning Shiva temple bringing all the clichés of 'sea of humanity' to mind amidst a sea of candles and prayer. On our way out Lakshmi, the temple elephant, took 10 rupee notes to bless us by placing her trunk on our heads.

Walking through the ancient jewelry bazaar the next morning took us back centuries with the vendors that still fill the streets. We left the crowds and traversed the Thungabhadra River on a little hand-woven boat to see more Shiva temples carved into rock. Climbing up 600 steps up the Monkey hill led to a primitive Hanuman temple crawling with monkeys

and lengurs for a gorgeous view. After two days of exploring giant monolithic statues, elaborate palaces and elephant stables, it still wasn't enough time to take it all in.

Easily my favorite spot in the city, even our massive group woke early to visit Lalbagh, a park including one of the four official corners of Bangalore. Surrounded by 240 acres of trees from around the world, the leisurely stroll was incredibly relaxing within the chaos of the city streets.

I spent the afternoon with my uncle who proudly gave me a tour his Nanomaterial Research lab at Institute of Science. After 26 years, I finally saw my grandmother again and managed to communicate in my broken Bengali. Long overdue conversation often came back to how India reminds us that there is little point in obsessing over details when so much is out of our control.

We spent an evening watching a play at the Rangashankaran Theater. With memories of many day-long BAGC play rehearsals from my youth, it was refreshing to see how playwrights are revered in India. The play depicting the familiar tensions between modernity and tradition may not have been novel, but it was a great way to spend an evening during a trip to India which is often associated with shopping and taking in the glory of centuries past.

Traveling with locals has more than a few perks, particularly the knowledge of reliable and tasty roadside restaurants with the standard Southern fare. I enjoyed delightful sticky sweet jackfruit fritters in an open kitchen revealing the basic mechanisms that churn out simple healthy and tasty meals for the masses. Our van served a dual purpose threshing the millet that was thrown on the ground by rural farmers during harvest season when we stopped to check out nesting cranes. We visited the elegant wooden summer palace and fort of Tipu Sultan, the tolerant Muslim leader who sided with the French and was one of the last standing against the British.

What a change it was to stay at the Bandipur National Park lodge with the largest concentration of tigers in nearby forest! In the clearest of night skies surrounded by glowing sets of deer eyes just beyond I fell asleep to the sounds of birdsong, knowing a locked door would keep out the wild boar that followed me back to my room. During morning safaris we saw a plethora of animals, though unfortunately missed a tiger sighting taken in by the jeep before us just 15 minutes before. We chatted with three boys who were just finishing their work on a tiger census. Out of 300 workers, 50 were scared off after signing their lives away in a waiver for the 6 day count. They told me that wild elephants were the most likely to attack humans. While I don't share the same taste for extreme adventure, I do travel to listen to the stories of such people.

From nature to royalty, our next road trip took us to Mysore. The museum of paintings frustrated me with the poor presentations but was saved by the display of exquisite Karnatic musical instruments. Thankfully, the grand Mysore Palace was freshly opened after the mourning period following King of Mysore's death. It was well maintained with inlaid doors, crystal footed furniture, peacock stained glass ceilings, and even a golden throne. While it made for lovely eye candy, it was hard to reconcile such grandiosity with the villages we drove through with the basic lodgings from the night before.

Back in the garden city of Bangalore we visited the Bull Temple, one of four corners of Bangalore, next to lovely Bugle Rock Park with trees laden with fruit bats. Nothing like a trip to India to remind one of how young the US is after a visit to a cave temple supposedly 2500 years old. Travelling reminded me

how cultures cross pollinate. The Naga or snake sculptures throughout the state are the same as those sprinkled throughout Angkor Wat and elsewhere in Cambodia.

For our last road trip, coconuts and electrolyte packages came to the rescue as I recovered from a bad Chinese meal while others visited the massive Jain statue at Shravanabelagola. Happily the next day I was able to drag myself to Bellur and Hallebid with their impressive architecture and sculptures. Hallebid alone had 1248 uniquely carved elephants just along the base symbolizing strength, and subsequent layers meaning courage, beauty and more. Years of Bharatnatyam dance lessons provided some insight for a trip to Bellur, with a temple dedicated to a queen who was also a famous Bharatanatym dancer. Every deity was in a dancing form, even our beloved, though sedate, Saraswati. Forty eight unique columns with Fibonnaci mathematical sequence dictating repeated forms filled a dark temple inside Bellur. Hours could be spent admiring and explaining just one wall of this stunning complex.

Our final pit stop was a wonderful respite at a coffee plantation, the beverage of choice throughout this trip. The shaded beans grew amidst rosewood and peppercorns tree with a diversity of vegetation all living symbiotically, so once again India reminded me of underlying connections between us all.

On my last evening, I joined my uncle's family once again for a New Year's party before spending the New Year itself sitting at an airport. This gathering felt more like Chicago with meat, fish, drinks and plenty of lively debate. Sitting halfway around the world, I felt like being in US completing a full circle even though I was far away from home.

Acknowledgement: Photos by Brian Rowe

Moments

Prakriti Chakrabarti

The child I was
often walked
barefoot on the grass
to feel the softness
of the mother earth.

There are times
when no one
passes by
the window open wide,
just the tears flowing dry.

At this stage of life
I come to realize
my happiness is
drenched with sorrows
and silence.

A January dawn,
I see falling
in front and back,
houses draped with
snow, snow, and more snow.

The shore stretches
far and near,
the ocean embraces
with vibrant motion,
longing and belonging.

I measure
my silence
by the daily ritual
with my God
in my presence.

Dandelions dazzle
the sparkling green,
the summer sun
frowns
to caution me.

It is winter
the day seems long
I click on a key
and my world
expands.

At mid night
my heart is startled
by the train
whistling high
to caution the passers by.

Across the books
as I stand
I wonder
how tall is knowledge
to hold my hands.

Through unbroken companionship
I learned
how wonderful life is
when someone
stands close by.

The autumn leaves
fall gently to the ground
as I pass
through the mist of
waking dawn.

As I hike
through the woods
I see the flowers
holding hands
with the twigs.

It hides behind the stars,
the mountains
and the oceans far,
I know it is there
and will know when it is near.

Stroll Down The Memory Lane

Priti Paul

The azure blue sky, warm sunshine, gentle breeze and the mild fragrance of flowers signify it is Sharatkaal, (season of Autumn). It is the time of the year for Durga Puja the most awaited time for millions. Especially the nip in the air at night with the delicate fragrance of those special flowers announce the advent of Ma Durga and her family into our hearts and home, thereby rekindling the dormant child-like state in all of us. I realize that I have been pining for 'good old days', the kind of nostalgia typically engaged in by my aunt (our phool-pishi) types, who was living abroad for a long time. I remember whenever I got to see my sweet little aunt, the song "amicini go cinitomare, ogobideshini" (I know yah I know you Oh foreign lady) popped up in my mind.

If you are a true, blue Bengali, steeped in the 'bangali' culture, Rabindranath Thakur just gets into your soul. My earliest memory is of my mother singing, sitting on the bed next to me "durdeshi sheirakhal chhele" (the shepherd boy from a distant place). In one line of the song the poet asks the boy "what can I offer you?"I still remember being sad and disappointed to hear the response of the boy "shudhutomargalar malakhani," only the garland that is draped around your neck. What a prudent young man, with missed opportunity! I would think he could have easily asked for a toy or some candies. Of course, my understanding of the Poet's writing improved with age and similar to all other young girls of my age I would sing or recite his poems much to the adoration of friends and relatives.

Memories are funny. Of the billions of experiences only a handful remains embedded in our grey matter. If they are pleasant, they are very much refreshing and reassuring.

It was a monsoon day in Kolkata, acity in West Bengal. The skies darken, the clouds rumble and women run to remove clothes hung out to dry. Children are asked to help their mothers and those too small to reach the clotheslines are asked to shut the windows. In older houses the women and children put pails in areas where the roof leaks. The wind is moving faster.The smell of 'rajanigandha,' the Tube Rose, the night blooming jasmine, fillsthe air with its strong aroma. The rain comes down in all fury. In the open field little boys take off their shirts, and a ball appears from nowhere. They kick it back and forth casually. They run across the field, with bare muddy feetstriving to play a good game. It is a moment perhaps they will remember and cherish later in their lives. In some houses young girls sit in the veranda and chat; then one sings a line of a song, the others catch up with the song "ajijharojharomukharobadaro dine" (on a pitter patter rainy day) and suddenly the melodious chorus fills the air. Some are relishing the "monsoon snacks." Avery mundane picture of lives, yet very relaxing.

On another occasion I was taking in the 'scenery' outside a barren ground, with loads of dumped rubbish, a few pathetic looking cows feeding on the garbage, a couple of street dogs barking at the passing cyclists and a little tea stall where workers from the nearby construction site unburdened the heavy loads they carried on their heads to refresh themselves with a cup ofchai (tea) and some dry loaves of bread!! It was a very dull picture indeed! To add to it, a little girl who looked about 4 or 5 years came from window to window in our bus asking the passengers for few Rupees. She repeated her request incessantly at every window and was 'shooed away' every time, sometimes with a scold. Soon, she came up to me and her unusually bright eyes looked up from her dirty little face and with her small muddy hands stretched out she repeated again and again, 'Aunty kuchRupaya de do…' (pease give me some rupees). I was moved by her persistent pleading and gave her few rupees. Thrilled with her success, the girl ran with glee to the

nearby tea stall. My glance followed her, curious to know what she would do with the money. I saw her buy few loaves of bread and a cup of tea run towards a very shabby wall nearby. There lay a sick old lady, very meek and feeble and this girl sat down beside her and fed her lovingly, talking to her all the time!!I was speechless. I was hiding my tears helplessly the rest of the way back home, overwhelmed with the magnitude of that simple, selfless deed of love, care and generosity. This raggedy little girl filled me with joy and hope and reassured me that the world is not as bleak as we often paint it! If only all of us emulate a bit of this little fallen angel, what a wonderful place our world would be.

Winter Storm

Sabita Busch

Every time I went downstairs
I found them staring at me,
because I piled them up one on top of the other.
Chicago's long dragging rough weather
induced me to search and locate them
to protect me
from the harsh nature's gift.
I was swooned over their cozy warm closeness
for couple of months.
At last I thought of giving them a shower,
to make them look bright again.
I looked around Chicago, for high quality eco friendly shining places.
So, I immersed myself
Into a literature search
on this complex global issue.
After my extensive intellectual endeavor
I realized that,
I was competent enough to make them
 happy and shiny again.
I picked them up one after the other
the short one and the tall one.
Stuffed them into the gentle agitator
along with some tennis balls,
after a delicate shower.
I was relieved that they had the freedom
 to play happily together,
 inside the gentle agitator.
Oh no!
They started kicking each other causing very loud sound
to score quick goals.
Suddenly, I heard a knock on my door.
To my surprise, I saw my neighbor in panic,
fearing about an intruder
in my house.
He was going to call the police
but he decided to check with me first.
I forgot that I was supposed to
supervise them frequently.
So I ran downstairs,
peeped through the door, and
discovered that the ball game was over.
I yanked them out
and hung them up quickly.
Believe me! they were fresh and smiling at me.
I said, thank you my down coats
You saved me from going to the police station.

An Enchanting Visit to VAROSHA Sites

Samar Kundu

Varosha is a non-profit charitable organization started few years back by our BAGC Members. As a long time contributor to Varosha, I wanted to see how these sites are doing with the help of Varosha. In few years, it has impacted alot in helping many disadvantaged women and girls in Bengal to become self-sufficient in sustaining their own lives. I am writing this to our BAGC Members to understand and know how our monetary support helps these poor and destitute people in our motherland. We should feel in our heart that we are helping people who desperately need help.

On February12, 2014, I had the privilege to visit only three sites near Kolkata which are being supported by Varosha. It is an unbelievable experience to see, feel and rationalize what it means to the few destitute peoples' lives which are supported by Varosha. The projects are being supported and partnered by a few, very dedicated volunteers of the Pub-Paschimof Kolkata such as Debshankar Roy, Swarup Saha and others.

I was escorted by one of the Pub-Paschim volunteers in the early afternoon to Thakurpukur, Kolkata. My first stop was to 'PuberAlo' in Goragacha. Itis a slum area, situated in the South-West part of Kolkata. When Varosha entered this slum with its partner Pub-Paschim, there was neither any hope nor any reasonable expectation from any young girl of this slum.

Varosha started a small and experimental 'Tailoring and Mechanized Embroidery' training for young girls in this slum in the latter part of 2011. Fifteen young girls were the first beneficiaries. Many of them are already earning their living using their newly learned tailoring skills. Goragacha training unifies these girls to struggle together. They have formed strong bonds among themselves. All girls are sticking together even after their successful completion and have formed an unique support system for all old and new girls like. I was amazed to see these girls become experts in tailoring and embroidery. They showed with pride what they can do in these skills. They also earn money in tailoring and embroidery work approximately Rs.2000 per month. It is a real success story for Varosha.

PUBER ALO Students and Volunteers

PUBER ALO Students displaying their work

My next visit was to 'JorirAlo' in Thakurpukur, Kolkata. On February 9th 2013, Varosha launched this jori training center. It was possibly the first opportunity that this economically challenged and socially restricted community received from anyone to be financially independent. Twenty-five, mostly minority community women, started their training with utmost excitement and energy.

Here in this location, I saw the girls were inserting jori in saris and they looked absolutely professional.

Actually, the dedicated trainer was bringing them a lot of work for joristitching and they were selling them for good profit. They can do this only in this training site which restricts them to limited work. These girls earn Rs. 1500-2000 per month. They could do much better in terms of business if they can get smaller version of the jori insert-bed in their homes. This is a real success project for Varosha.

JORIR ALO Students

JORIR ALO Design

My final visit was to 'DiptoAlo'in New Alipore. Varosha has proudly opened a Learning Center in Natun-Para (New Alipore Basti). Forty children of this slum come to this center every day after their formal school is over. In this center they learn the important aspects of being successful in real life. They learn three different subjects: English, Math and Computer skills.

It was very nice to see that a local Trinamool Congress leader Mr. Firad Hakim helped build this school with all modern facility. This facility is very energized and has become an example for many other slums in the area.

It was nice to see that many of the students learn to be disciplined, learn pranayama and learn to speak English. Iheard a few students speaking English fluently and read poems in English. Some were even learning to dance. All the students were given a very healthy lunch. It was very nice to see them grow in a very positive way. It is a great success project Varosha.

DIPTO ALO Students with Sewing Machines

Lunch time for DIPTO ALO Students

An Appeal to BAGC Members. Please help Varosha as much as you can so these poor girls and boys can enrich their lives and become self-sufficient.

> ***You can't cross the sea merely by standing and staring at the water***
>
> *– Rabindranath Tagore*

एक पाती परमहंस देव के नाम

रेखा मैत्र

अब तक तो तुमसे
शिकायत ही रही
आज तुम्हारी एक
बात याद आई
जिसका माने था
जब तक जिओ
तब तक सीखो।

कामिनी-कन्चन त्याग
तुम्हारे इस एक बाक्य को
बार-बार नाराजगी से दोहराया
तो उसमें एक और अर्थ पाया
कामिनी को क्यों
कामना को त्याग टूँ
तो मेरी लड़ाई तुमसे खत्म।
इच्छा को ही छोड़ दिया जाए
तो स्त्री - पुरुष का झगड़ा ही समाप्त।

अब प्रेम की कहानी
सुनो मेरी जुबानी
मैंने भजनों की सोकें लीं
प्रेम के घागे से बान्धीं
भक्ति की झाड़ू बना ली
मन के बाहर - भीतर की
सारी गर्द बुहार डाल।

माँ शारदा के चरणों में बैठकर
अपने कन्हैया के पास
तुम्हें भी बिठा लिया
तुम और कन्हैया तो
एक ही हो ना ।।

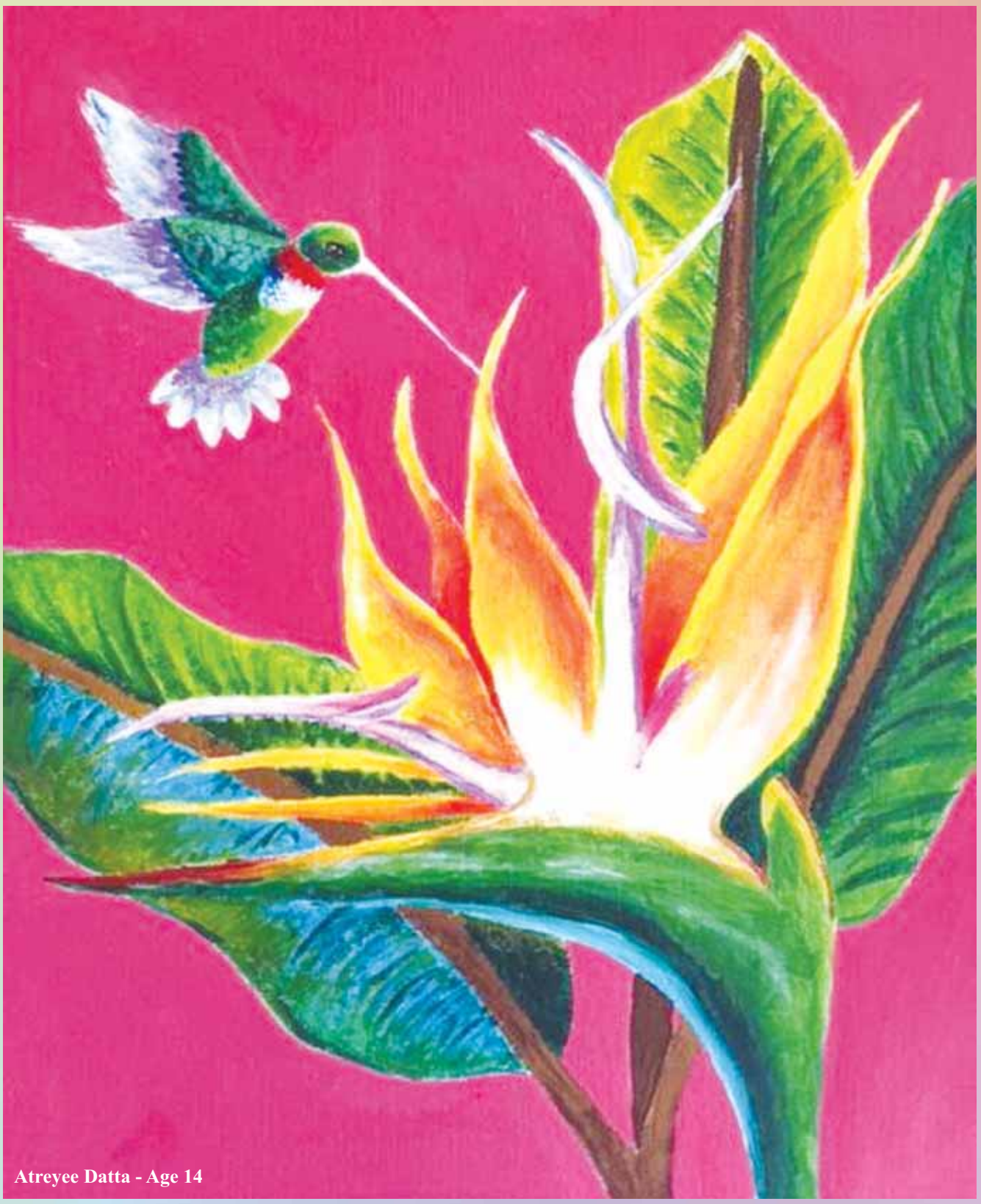

Atreyee Datta - Age 14

শারদ শুভেচ্ছা

বি এ জি সি কার্যবাহী কমিটি

BAGC THANKS ITS PLATINUM SPONSOR

Mr. Gopi Addanki
President, Media Systems Inc,
869 E. Schaumburg Rd, Ste #274,
Schaumburg, IL 60194
Contact Phone Number : 847-882-0321
Email: info@mediaus.com
URL : www.mediaus.com